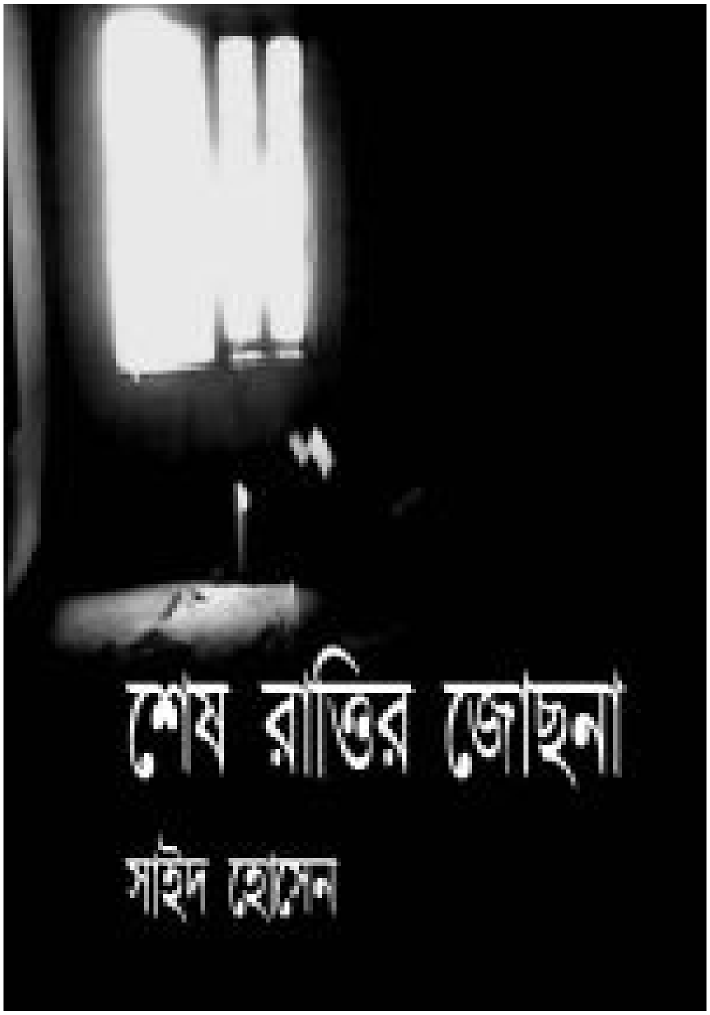
শেষ রাত্তির জোছনা
সাইদ হোসেন

শেষ রাত্তির জোছনা

*

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০০৮

Date of first edition publication: March 14, 2008

© সাইদ হোসেন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Published by Sayed Hossain

Contact Address:
যোগাযোগ:

Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

©Sayed Hossain 2008

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

ISBN No. 978-983-43934-0-3

** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

© Shesh Ratteer Josna, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

।। এক ।।

বিকেলের শহর

বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে । ময়মনসিংহ শহরের উপর বিকেলের শেষ আলো পড়েছে । রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু করে বিদ্যাময়ী স্কুল, বড় বাজারের মোড়, জিলা স্কুলের রাস্তায় দীর্ঘ ছায়া পড়েছে । ধীরে ধীরে সূর্যটা সরে যাচ্ছে । আবার সে দেখা দেবে ভোর না হতেই । ব্রহ্মপুত্রের তল থেকে উঠে আসবে সে তারপর ছড়িয়ে দেবে তার আলো । সেই আলোতে আলয় আলয় ভরে উঠবে শহরটা ।

পুরো ময়মনসিংহ শহরটা ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে গড়ে উঠেছে । বছর পনের আগে নৌকা করে নদী পার হতে হতো । ঘাটে থাকতো হাজারো নৌকা । ওপারের মানুষেরা নৌকায় চড়ে শহরে আসতো । ফিরে যেত সন্ধ্যে হলে । বড় বড় গাড়ি পার হতো ফেরিতে চরে । ফেরিগুলো গিয়ে ভিরতো নদীরে ওপারে । পিপিলিকার মতন নেমে আসতো গাড়িগুলো তারপর সোজা চলে যেত হালুয়া ঘাট । এই হালুয়া ঘাটেই রয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত বন্দর ।

এখন সে দৃশ্যপট পাল্টে গেছে । নৌকা করে আর নদী পার হতে হয় না । শক্ত মজবুত ব্রীজ হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের উপরে । মানুষ, রিকশা, গাড়ি সেই ব্রীজ দিয়ে যাতায়াত করে । পূর্ণিমা রাতে পুরোটা ব্রীজ শীতল আলোয় ভরে উঠে । এখন আর হালুয়া ঘাটে যেতে ফেরি লাগে না । বড় বড় গাড়ি, ট্রাক ব্রীজ কাঁপিয়ে নদীর ওপারে চলে যায় ।

ব্রহ্মপুত্র এত কাছে যে শহরের জানালা গলিয়ে ব্রহ্মপুত্রের আলো হাওয়া চোখে পড়ে । তখন বিকেল হয়ে আসছিল । আলো কমে আসছে ধীরে ধীরে । চারিপাশে আলো ছায়া । সেই আলো ছায়ার মধ্যে আনিছা বাড়ী ফিরছে । বিকেলের শেষ আলো পড়েছে আনিছার নাকে মুখে ।

আজ চার বছর হলো আনিছার চাকরির বয়স । শহরের শেষ মাথায় সরকারি ব্যাংক । সেখানে চাকরি করে আনিছা সিনিয়র রুরাল ক্রেডিট অফিসার হিসেবে । কৃষকদের ধার দেয়া আর তাদের ফসলের তদারকি করা আনিছার প্রধান কাজ । আনিছার আন্ডারে দুইজন অফিসার । ওরা আনিছাকে সাহায্য করে । কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেছে আনিছা তারপর চাকরিটা পেয়ে যায় ।

বড় বাজারের শেষ মাথায় আনিছাদের বাসা । ছোট ভাই অলি আর মা'কে নিয়ে থাকে । ছোট্ট এই বাড়ীটা আনিছার বাবা করেছিলেন । বাড়ীর পেছনে এক ফালি জায়গা, সেখানে আনিছাদের বাগান । আনিছার ভাই অলি বাগান দেখাশুনা করে । ছুটির দিনগুলোতে আনিছা নেমে পড়ে বাগানে । শুরু হয় বাগান পরিচর্যা ।

আনিছার ব্যাংকটা একেবারে ব্রহ্মপুত্রের গা ঘেষে । ব্যাংকে বসে নদীর কুলকুল শব্দ শোনা যায় । সেই শব্দের তালে তালে আনিছা কাজ করে যায় সারাদিন ভর । যখন খুব ক্লান্ত লাগে, ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দেয় তারপর তাকিয়ে থাকে নদীর গভীরে । কি সুন্দর তালে তালে ঢেউ আছড়ে পড়ছে নদীর পাড়ে ।

আনিছাদের বাড়ীর পাশেই তার ব্যাংক অফিস । সকাল নটায় আনিছা হাঁটা দেয় ব্যাংকের দিকে, বিকেল পাঁচটায় ফিরে আসে । ব্যাংকে যাবার পথটা ব্রহ্মপুত্রের পাড় ঘেষে চলে গেছে । প্রতিদিনের মতন আজও বাড়ী ফিরছে আনিছা । ঘিয়া রংয়ের শাড়ি পড়েছে সে, গায়ে মোটা জামা । মাথায় হালকা কাপড় । পড়ন্ত বিকেলের শেষ আলো পড়েছে আনিছার নাকে মুখে । ব্রহ্মপুত্র থেকে উঠে আসা শীতল হাওয়ায় আনিছার শাড়ির ধারটা উড়ছে ।

আনিছা দেখলো, নদীর পাড় ঘেষে সাদা বকগুলো দাঁড়িয়ে আছে । মাঝে মাঝে ডুবিয়ে দিচ্ছে মাথা অগভীর জলে । দূরে, ঐ দূরে নদীর ওপারে শম্ভুগন্জ । শম্ভুগন্জে মস্ত বড় মসজিদ হয়েছে । সেই মসজিদের মিনার চোখে পড়ল । বিকেলের আলোতে মিনারটা চিক চিক করছে থেকে থেকে ।

এক কৃষক পাশ দিয়ে যাবার সময় বললো, আপা, সালাম । কৈ যান ?

- কোথাও না । বাড়ী ফিরছি ।

- কোনদিকে আপনার বাসা ?

- ঐ তো বড় বাজারের শেষ মাথায় ।

লোকটা বললো, এবারে কৃষি ঋণটা ঠিক সময় পাইছি । আশা করি ফসল ভাল হবে ।

- বিক্রি করবেন না ?

- না আপা । সারা বছর ধরে খামু বউ পোলাপান নিয়ে ।

- তাহলে ঋণ শোধ দেবেন কিভাবে ?

- সেজন্য ছাগলের চাষ করছি, সেই থেকে দেবো । আর সরকার মাফ করে দিলে তো হলোই । গেল বছর সরকার কৃষি ঋণ মাপ করছে । আশায় আছি এই বছোরো করবো । আপা, আপনার পোলাপান কয়জন ?

আনিছা হেসে দিলো । বললো, আমার তো সংসার হয়নি এখনো ।

- কি বলেন আপা ?

- সত্যি আমার কোন ছেলে মেয়ে নেই ।

লোকটা আর কথা বাড়ালো না । অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইলো তারপর মাথা নিচু করে অন্য দিকে চলে গেল ।

আনিছার বাবা হাসেম সাহেব । হাসেম সাহেবের স্বপ্ন ছিল তার মেয়ে একদিন অনেক লেখাপড়া করবে । পড়াশোনা ভালবাসতেন হাসেম সাহেব । নিজে পড়তে পারেননি নানা কারণে । বি.এ. পড়বার পর আর এগুতে পারেননি । মেয়েকে দিয়ে তাই স্বাদ পূরণ করবেন ।

স্টুডেন্ট লাইফে আনিছার অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছে । সে দিকে তাকাননি হাসেম সাহেব । বার বার পিছিয়েছে আনিছার বিয়ে । মাস্টার্স ডিগ্রি না করিয়ে মেয়ে দেবেন না তিনি । একদিন আনিছা পাশ করলো কিন্তু হাসেম সাহেবের দেখা হলো না । আনিছা যখন ইউনিভার্সিটিতে থার্ড ইয়ারে, তখন তিনি চলে গেলেন । বাবার ছবির পাশেই আনিছা তার সার্টিফিকেট বাঁধিয়ে রেখেছে । হাসেম সাহেবের হাসি ভরা মুখ সার্টিফিকেটের দিকে তাকিয়ে আছে ।

একটা গান হাসেম সাহেব প্রায়ই শুনতেন । *এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে, এই দিনেরো লইয়া যাইবো সেই দিনেরো কাছে* । এই গানটা তিনি শুনতেন আর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন । হাসেম সাহেবের মনে হতো তার মেয়ে একদিন অনেক লেখাপড়া করবে তারপর এই দিনকে নিয়ে যাবে সেই দিনের কাছে ।

পরিচিত কেউ টাকার অভাবে পড়তে পারছে না, এ কথা হাসেম সাহেবের কানে গেলে তিনি একটা বিহিত করতেন । হয় নিজের ব্যাংক থেকে টাকা তুলে দিতেন অথবা মাসের খরচ কমিয়ে আনতেন । মাঝে মাঝে ক্ষেতের ধান বিক্রি করে টাকা তুলে দিতেন পড়ুয়ার হাতে । মানুষ যে পড়াশুনা এতো ভালবাসে, হাসেম সাহেবকে না দেখলে জানা হতো না ।

আনিছা তার বাবার মতন হয়েছে । পড়াশুনার জন্য কেউ সাহায্য চাইলে আনিছা পিছপা হয় না । কি সুন্দর লাল-নীল মলাটের বই নিয়ে ছেলেমেয়েরা পড়তে বসে । নূতন বইয়ের ঘ্রাণই আলাদা । নূতন বই এলে আনিছা নাক লাগিয়ে ঘ্রাণ নেয় । কেমন মিষ্টি আষটে ভরা । কৃষকেরা সারারাত ব্যাপি ধান সেদ্ধ করলে ঠিক এ রকম গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে ।

।। দুই ।।

আনিছা

এখন থেকে চার বছর আগের কথা । আনিছা সবেমাত্র পাশ করে ব্যাংকে ঢুকেছে । একদিন ভোর না হতেই পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলা এসে হাজির । আনিছার জন্য বিয়ের প্রস্তাব এনেছে সে ।

আনিছার মা সুরাইয়া বেগম বললেন, কার বিয়ের কথা বলছেন ?

- কেন, আমাদের আনিছার ?

ভদ্রমহিলা বলতে লাগলেন,

সোনার টুকরো ছেলে । প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি করে । ছেলের মা এসেছিলো আমাদের বাসায় । আনিছাকে পছন্দ করে গেছে ।

- কবে, কখন দেখলো ?

- এইতো কদিন আগে । ছেলেরা ঢাকায় থাকে । ছেলের বাবা নেই । আপনি কি বলেন আপা ?.

সুরাইয়া বেগম চুপ হয়ে গেলেন । বললেন, আপনি ছেলেকে দেখেছেন ?

- অনেক বার দেখেছি । ছেলেকে অপছন্দ হবে না আপা । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছে । ওর বাবাও ভাল চাকরি করতো । ঢাকাতে নিজস্ব বাড়ী আছে ।

- ঠিক আছে, ভেবে দেখি । কদিন সময় দিন ।

- ঠিক আছে আপা । এ নিয়ে তাড়াহুড়ার কিছু নেই । ছেলের মাকে পরে জানালেও চলবে ।

তার দুদিন পর সাকিব এলো । তখন বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, আকাশে অনেক মেঘ । বৃষ্টি নামবে নামবে করছে ।

আনিছাদের খালাতো ভাই সাকিব । সাকিবের মা মারা গেছে অনেক বছর হলো, সেই থেকে বাবাকে নিয়ে থাকে । রাস্তার ওপারে ওদের বাসা । ইংরেজীতে মাস্টার্স করেছে সাকিব তারপর বিসিএস দিয়ে সরকারি কলেজে । আনন্দ মোহন কলেজে ওর পোস্টিং হয়েছে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে । রিকশায়

চেপে প্রতিদিন কলেজে যায় সাকিব । পনের মিনিটের পথ, হেলে দুলে রিকশাটা ঠিক ঠিক পৌছে দেয় সাকিবকে ।

সুরাইয়া বেগম বললেন, তোকে শুকনো দেখাচ্ছে কেনো ?

- কই, আমি তো ভাল আছি খালা । আবার কখন শুকনো দেখালো ?

- দেখাচ্ছে ।ভাল করে আয়নায় গিয়ে দেখ খিদে লেগেছে ? কিছু খাবি ?

- হ্যাঁ লেগেছে । দিতে পারো ।

- তুই বস । আনিছাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

দেখতে দেখতে নুডলস বানিয়ে আনলো আনিছা ।

- এই নাও সাকিব ভাই । একটু ঝাল বেশি দিয়েছি । তুমি তো ঝাল পছন্দ কর ।

- হ্যাঁ করি, এই বলে খেতে শুরু করলো সাকিব তারপর বললো, ব্যংকের চাকরি কেমন লাগছে ?

- বেশ মজাই তো । গ্রামে গন্জে ট্যুর থাকে । প্রায় সাইট দেখতে যাই ।

- তোমার প্রফেসারি ?

- চলে যাচ্ছে । এখন রাতে শিফট পড়েছে । মাঝে মাঝে রাতে ক্লাস হয় । রাতে ক্লাস নিতে দারুণ লাগে ।

- তোমার নাকি অন্য কলেজে পোস্টিং হচ্ছে ?

সাকিব হেসে বললো,

সরকারি চাকরি । ট্রান্সফারের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই তবে ময়মনসিংহে আসবার জন্য অন্য জেলার প্রফেসারদের পীড়াপিড়ি কম । ট্রান্সফার করে দিলে চলে যাব । চেষ্টা করব ময়মনসিংহের কাছাকাছি থাকবার ।

তারপর একটু থেমে বললো, শুনলাম তোমার বিয়ে ?

- কে বললো ?

- খালাই তো বললেন । ছেলে ব্যাংকার, ভালো চাকরি করে । ঢাকায় থাকে ।

আনিছা চুপ হয়ে গেলো । বললো, এই আর কি ।

- তোমার কি মত ?

- আমার কোন মত নেই । মা যা ঠিক করবে তাই হবে ।

সাকিব কিছু বললো না ।

সুরাইয়া বেগম এসে বললেন, আমাদের সাথে রাতে খেয়ে যাস ।
- না খালা আমার রাতে ক্লাস আছে । আজ আর পারছি না, এই বলে সাকিব বেরিয়ে গেল ।

অনেক আগে একবার আনিছার অসুখ হয়েছিলো । থেকে থেকে গলায় ব্যথা করতো, রাতে ঘুম হতো না । অনেক ডাক্তার দেখানো হলো । কিছুতেই কিছু হচ্ছে না । আনিছাকে ঢাকায় আনা হলো । সুরাইয়া বেগম আর অলি এলো আনিছার সাথে । সাকিব তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, ইংরেজীতে অনার্স, কেবল মাত্র ভর্তি হয়েছে ।

একমাস পরে রইলো আনিছা ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে । চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল তারপরেও আনিছাকে সবাই যত্ন করলো । হঠাৎ করে সাকিব এসে হাজির । এক মাসের ছুটি নিয়ে এসেছে সে । মাঝে মাঝে অনেক রাতে আনিছার ঘুম ভেঙে যেত । চোখ মেলে দেখতো সাকিব বসে আছে ।
- সাকিব ভাই একটু পানি দেবে ?
- এই নাও ।
উসুম উসুম গরম পানি বাড়িয়ে দিল সাকিব । প্রতি সকালে আনিছার জন্য পানি ফুটায় সাকিব তারপর ফ্লাস্কে রেখে দেয় । আনিছা চাইলে পানি এগিয়ে দেয় । উসুম উসুম গরম পানি খেতে বলেছে ডাক্তার ।

কিছুদিন পর আনিছার গলায় অপারেশন হলো । অপারেশনের পর খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠলো আনিছা । দশ দিনের মাথায় উঠে দাঁড়াল সে । ফিরে এলো ওরা ময়মনসিংহে ।
সাকিব চলে গেলো রাজশাহী । যাবার সময় আনিছার হাতে কিছু বই দিল, নিউমার্কেট থেকে কিনেছে সে ।
- অবসর সময় পোড়ো ।
আনিছা মাথা নেড়ে সায় দিল ।
- তুমি ময়মনসিংহ যাবে না সাকিব ভাই ?
- আমার ইউনিভার্সিটি খোলা । এখন আর কোথাও যাওয়া না । গরমের ছুটিতে দেখা হবে । ঔষধগুলো ঠিক মতন খেও আর উসুম উসুম গরম পানি ।
সাকিব ভাই, তোমাকে ধন্যবাদ ।
সাকিব হাসলো । কিছু বললো না ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অনার্স পড়বার সময় বড় বড় সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটে সাকিবের । হোমারের ইলিয়ড, ওডেসি খুব মন দিয়ে পড়েছে সাকিব । সফেক্লিসের ইডিপাস আর রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা খুব ভাল ভাবে পড়া । আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা ভাল লাগে । ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দ্যা সি পড়ে নিজেকে আবিস্কার করলো ও । জ্যা-পল-সার্তের দর্শনের মধ্যে অস্তিত্বের ধারণা পায় সাকিব, তারপরেও অস্তিত্ববাদ বলতে জ্যা পল সাত্রে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা এখনো অস্পষ্ট সাকিবের কাছে ।

ছোটকালে মা হারায় সাকিব তারপর থেকে খালা সুরাইয়া বেগমের আচলের নিচে বড় হয়েছে সে । সেই দিন স্কুলে যেত সাকিব, এখন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করে । ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি সাকিবের ঝোঁক ছেলেবেলা থেকে । স্কুল, কলেজের ইংরেজী পরীক্ষায় সাকিবের কাছে কেউ ভিড়তে পারতো না । ইউনিভার্সিটির শিক্ষকেরা ওর ইংরেজী দেখে বলতো এ ছেলে একদিন অনেক বড় হবে । কি মন দিয়ে সাকিব ইংরেজী পড়ে । সারাদিন বসে চিন্তা করে কিভাবে সুন্দর একটি ইংরেজী লাইন লেখা যায় । এই যে সাকিবের ইংরেজীর এত প্রশংসা কিন্তু ক্লাসের বাইরে সাকিবকে কেউ কখনো ইংরেজী বলতে শোনেনি ।

সাকিবের বন্ধু বলতে আনিছার ভাই অলি । ম্যাট্রিক দেবে জিলা স্কুল থেকে । সময় পেলে দুজনে গল্প করে । কি গল্প করে ওরাই শুধু জানে । সাকিব চুপচাপ স্বভাবের ছেলে, অন্যের কথা শুনতে পছন্দ করে । বেশির ভাগ সময় অলি বলে যায়, সাকিব চুপচাপ শুনে । অলি-সাকিবের বয়েসের পার্থক্য বিস্তর কিন্তু কোথায় যেন ওদের মিল তাই গল্প করতে অসুবিধে হয় না । সাকিবের সাথে থেকে অলি অনেক ইংরেজী শিখেছে । এখন নিজেই বড় বড় সেন্টেস তৈরি করতে পারে । ভুল হলে সাকিব দেখিয়ে দেয় ।

অলির ইংরেজী শেখার আগ্রহ দেখে সাকিব মাঝে মাঝে তার কলেজের লেকচারে অলিকে বসতে দেয় । সবার সাথে তাল মিলিয়ে অলি লেকচার নোট লিখে নেয় তারপর বাসায় ফিরে সাকিবের সাথে বসে । যা যা বুঝতে পারেনি ক্লাসে, সেগুলো বুঝে নেয় । হোমার, হেমিংওয়ে, সফেক্লিস, রবার্ট ফ্রস্টের সাহিত্য অলির আর অজানা নয় । কদিন হলো আলেক্সান্দর পুশকিন পড়ছে অলি । সাকিব পড়তে দিয়েছে । সাকিবের সাথে মিশে আলির জীবনে গভীরতা এসেছে । এখন সে সাজিয়ে কথা বলতে পারে । অল্প বয়সে জীবন সম্পর্কে অনেক ধারণা পেয়েছে অলি ।

অলি যা কিছু শেখে, আনিছাকে বলে তারপর খুকুকে । মন দিয়ে শোনে খুকু । তারপর এক সময় বলে, অলি ভাই, তোমার জন্য পানি আনি ?

- না লাগবে না । তুই বোস ।

খুকু বলে, আরো কিছু বলো ।

অলি আবার বলতে শুরু করে ।

খুকু থাকে অলিদের পাড়াতেই । দুই গলি পরে খুকুদের বাসা, ক্লাস নাইনে পড়ে । অলির সাথে কিভাবে যেন ভাব হয়ে গেছে । দুই বাড়ীর লোকেরা জানে ওদের সম্পর্কের কথা ।

খুকুর সব ঠিক ছিল, শুধু ডান হাতের তালু থেকে চামড়া সাদা হয়ে উঠছে । প্রতি মাসে একটু একটু বাড়ে । ডাক্তারির ভাষায় এটা স্কিন ডিসিস । বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই, নিরবে মেনে নিতে হবে এর বয়োবৃদ্ধিকে । ঢাকা শহরের বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে । কোলকাতাতেও চেষ্টা হয়েছে কয়েক দফা । কোন কাজ হয়নি । ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে এই সাদা চামড়া ।

প্রায় বিকেলে খেলতে যায় অলি । তখন বন্ধুদের হাত টেনে দেখে । কি সুন্দর হাত, কোথাও কোন দাগ নেই । খুকুর কথা মনে পড়ে তখন আর খেলতে ইচ্ছে হয় না । বাড়ী ফিরে আসে । অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে বাড়ীর বারান্দায় তারপর মাগরিবের আজান দিলে হাতমুখ ধুয়ে নামাজে যায় । নামাজে খুকুর জন্য দোয়া করে অলি ।

।। তিন ।।

সাকিব আর অলি

আনিছার ছোট ভাই অলি । ম্যাট্রিক দেবে কিছুদিন পর । এই অলির সাথে সাকিবের কি সম্পর্ক, তা বলা কঠিন । তবে অলি যে সাকিবের সাথে আলাপ না করে কোন কাজ করে না, সেটা বলা যায় । যখন অলি সময় পায়, সাকিবের কাছে গিয়ে বসে । তারপর দুজনে গবেষণা করে কিভাবে বাগান সাজানো যায় ।

ইংরেজী শেখার পাশাপাশি সাকিব আর অলির আগ্রহ গোলাপের চাষ করা । গত তিন বছরে ওরা অনেক গোলাপ ফুটিয়েছে । দুজনে বসে পড়াশুনা করে । গোলাপের উপর নানা বই নিয়ে এসেছে ওরা । মাঝে মাঝে কৃষি দফতরে হাজির হয় ।

সাকিব আর অলির প্রথম টার্গেট নানা রঙের গোলাপ ফোটানো তারপর গোলাপের সাইজটা বড় করা । টেলিভিশনে অনেক বড় বড় গোলাপ দেখেছে ওরা । কিভাবে ঢাউস আকারের একটা ফোটানো যায়, তা নিয়ে ওদের ব্যস্ততা ।

একবার কিভাবে যেন ওরা বড় সাইজের একটা গোলাপ ফোটালো । এত বড় যে, পাড়ার লোকেরা দেখতে এলো । দেখতে দেখতে শহরের অনেকেই । ছোট-খাট ময়মনসিংহ শহর, একটুতেই খবর ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয় পত্রিকার ক্যামেরাম্যান এসে হাজির । গোলাপের ছবি তুলে নিয়ে গেল ওরা । দুদিন পরেই পত্রিকায় দেখা গেল সেই ছবি । সাকিব আর অলির যে কি আনন্দ সেদিন ।

একবার জাপান থেকে টিম এলো ময়মনসিংহে । নানা ধরনের ফুলের প্রদর্শনী করলো ওরা । সবচেয়ে বেশি দেখালো গোলাপ ফুল । গোলাপ ফুল যে এত পদের হয়, অলি-সাকিবরা প্রথম জানলো । সাতদিন রইলো ওরা । যে যা প্রশ্ন করছে, সাথে সাথে জবাব পাচ্ছে । জাতি হিসেবে জাপানিদের ভদ্রতার সুনাম আছে কিন্তু সেই ভদ্রতা যে এত বেশি, ময়মনসিংহ বাসীরা প্রথম জানলো ।

ফুকুসিমা নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন সেই টিমে । বয়স পন্চাশের কাছাকাছি । তার কাছে অনেক কিছু শিখলো অলি-সাকিবেরা । গোলাপ ফুল নিয়ে কোন সমস্যা হলে আলি চিঠি দেয় ফুকুসিমাকে, সাথে সাথে জবাব পায় । এভাবে অলি-সাকিবেরা মস্ত বড় গোলাপ ফুটিয়ে দিল । এ গোলাপটা আগের যে কোন সাইজের চেয়ে বড় । বাহবা পড়ে গেল সারা শহরে ।

অলি বললো, সাকিব ভাই, চল সেলিব্রেট করি ।

- ঠিক আছে চলো ।

রাতের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লো দুজন । ঘড়ির কাটা রাত নটা ছুঁয়েছে । দুলু মিয়া দোকানের ঝাপ ফেলে বাড়ী ফিরে গেছে অনেকক্ষণ । রাস্তায় দুই একটা রিকশা চোখে পড়লো । ওরা হাঁটা দিল সোজা নদী বরাবর । বড় বাজারের পাশেই ব্রক্ষ্মপুত্র । দশ মিনিটের মাথায় ওরা ঘাটে পৌছলো । সামনেই বয়ে চলেছে নদীটা । জোছনার আলোতে নদীর চেহারা পাল্টে গেছে । খুব অচেনা মনে হলো ব্রক্ষ্মপুত্রকে ।

আগে থেকে রহিম মাঝিকে বলে রাখা হয়েছিল । রাত ভর ওরা ঘুরে বেড়াবে নদীর মাঝে । ভোর হলে ফিরে আসবে ঘাটে । সেদিন ছিল ভড়া পূর্ণিমা । সাদা আলোয় ফক ফক করছে চারিপাশ । সেই আলোতে ওদের ছায়া পড়লো নদীর ঘাটলায় ।

রাত দশটায় ওদের নৌকা ছাড়লো । মাঝারি সাইজের নৌকা । মাঝখানে সুন্দর করে পাটি বিছানো, চট আর বেত দিয়ে বুনানো । কাঁচা বেতের গন্ধ পেল অলি ।

নৌকা বয়ে চলেছে উত্তরমুখী । অলি-সাকিব পাটিতে বসেছে । রহিম মাঝি একেবার মাথায় । নদীর হাওয়ায় ওদের চুল উড়ছে ।

অলি বললো, দেখ ব্রীজটা ? কেমন ভুতের মতন দাঁড়িয়ে ।

সাকিব বললো, পাহাড়ের মতন । মনে হয় কিং কং ।

- ঠিক তাই । আবার এসেছে সিনেমাটা, দেখবে ?

- চলো । কোন হলে চলছে ?

- অলকায় ।

- ঠিক আছে । সামনের শুক্রবার রাতের শো দেখবো । আমি টিকেট কেটে বাড়ী ফিরবো । আনিছা আর খালাকে বলে রেখো ।

খুশি হয়ে গেল অলি ।

- দারুণ হবে সাকিব ভাই । দৈত্য-দানবের সিনেমা মার খুব পছন্দ ।

- হু । ছোটবেলা থেকেই খালার ঝোঁক আছে । ভয়ে মরে যাবে তারপরেও দেখবে । চোখ কান বন্ধ করে আঙুলের ফাক দিয়ে দেখবে ।

অলি আর সাকিব হেসে উঠল ।

অলি বললো, তোমার শীত করছে ?

- হ্যাঁ, চাদরটা বের করো । তারপর একটু থেমে সাকিব বললো,

আজ বিকেলে খুকুর সাথে দেখা । তোমার খোঁজ করছিল । তুমি তো মাঠে খেলতে গিয়েছিলে ।

- কি বললো খুকু ?

- না কিছু বলে নি ।

একটা ব্যাগে অনেক কিছু এনেছে ওরা । গায়ে দেবার চাদর, নৌকায় বিছানোর মোটা কম্বল আর গুটি কয়েক প্লাস্টিকের বালিস । ফুঁ দিয়ে অনায়েসে ফোলানো যায় ।

রাত বাড়ার সাথে সাথে ক্ষুধা লাগবে । নদীর হাওয়ায় এমনিতেই ক্ষুধা বেড়ে যায় তাই খাবারের ব্যবস্থা করেছে ওরা । তিন চার প্যাকেট বিস্কুট, আনিছার ভেজে দেয়া ডিমের মামলেট আর এক হালি সেদ্ধ ডিম । ওদিকের পোটলায় আছে ফ্লাস্ক ভর্তি পানি আর কফি ।

চাদর জড়িয়ে বসেছে ওরা । প্লাটিনামের কাটা রাত বারটা পেরুলো । পূর্ণিমার চাঁদ মাঝ আকাশে ঠেকেছে, সেই আলোতে থৈথৈ করছে হাজারো মণিমুক্তো । সেই মণিমুক্তো মাড়িয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে ।

অলি জিজ্ঞেস করলো, রহিম ভাই কিছু খাবে ?
- হো । দিতে পারেন, নদীর বাতাসে খিদা লেগেছে ।

বিস্কুটের কৌটাটা বাড়িয়ে দিল অলি । সেই সাথে মামলেট । অলি আর সাকিব বিস্কুট মুখে নিল । ফাঁকে ফাঁকে গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে ওরা । দুই এক চুমুকে ওরা চাঙা হয়ে উঠল ।
রহিম মাঝি বললো, সাকিব ভাই, কাল কলেজ আছে ?
- না । কাল পরশু ছুটি । বুধবারে খুলবে সব ।
- আমার পোলাডারে আপনাদের কলেজে পড়ানোর খুব শখ ছিল । পোলাডা পড়লো না । ঘাটপাড়ে আজেবাজে পোলাপানগো সাথে মিশে । ওদের সাথে গাজা টানে তারপর রাইত বিরাইতে বাড়ী আসে, এই বলে রহিম মাঝি জোড়ে শ্বাস নিল ।
সাকিব বললো, আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েন । দেখি কি করা যায় ।
- কতবার বলেছি । এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে তারপর গিয়ে বসে গাজার আড্ডায় ।
সাকিব কিছু বললো না ।

দেখতে দেখতে নৌকা অনেক দূরে চলে এসেছে । এখন আর ময়মনসিংহ শহর দেখা যায় না । শুরু হয়েছে ক্ষেতখোলা । সারাটা মাঠ ভরে আছে ধানের শিষে । শিষের মাথা দুলছে থেকে থেকে ।
অলি বললো, সাকিব ভাই, আজ সকালের প্রগ্রাম কি ?
- বল, কি করতে চাও ?
- চল, ঢাকা যাই সকালের ট্রেনে । দুদিন হলো গোলাপের মেলা শুরু হয়েছে । দেখে আসি কত বড় গোলাপ ওরা ফুটিয়েছে ।
সাকিব কথা বললো না কিছুক্ষণ । তারপর বললো,
- আজ না । কাল সকালের ট্রেন ধরবো । আজ কিছু কাজ আছে, না করলেই না ।
অলি বললো,

এবার ক্যামেরা নিয়ে যাব । সেই সাথে গোলাপ মাপার স্কেল । গোলাপগুলোর এ্যাক্সাট মাপ নিয়ে আসবো তারপর আমাদের সাথে মেলাবো । আমাদের গোলাপ কিন্তু কম বড় না সাকিব ভাই, কি বলো ?

- হু তবে ঢাকারগুলো অনেক বড় । আমাদের টার্গেট হবে এর চেয়েও বড় করা ।

- ঠিক তাই, এই বলে অলি লাফিয়ে উঠল । অতি উৎসাহে দাঁড়িয়ে গেছে সে । তাকে যে মস্ত বড় গোলাপ ফোটাতেই হবে ।

- বেশি লাফালাফি করো না, পড়ে যাবে । আনিছাকে জিজ্ঞেস করে দেখো । সে কিভাবে নদীতে পড়ে গিয়েছিল ।

লাফালাফি থামিয়ে অলি বললো, সে বার তুমি ছিলে বলে আনিছা আপু বেঁচে গেছে ।

সাকিব কোন কথা বললো না । চুপ হয়ে রইলো ।

কিছুক্ষণ পরে সাকিব বললো, ফাহিমদের বাসায় কটা গোলাপ ফোটালে ?

- বেশ কয়েকটা । বাজারে বিক্রি করেছে ফাহিম । প্রতি গোলাপে দুই টাকা করে পায় ।

- আর কার কার বাসায় গোলাপ ফোটালে ?

অলি হেসে বললো,

এ নিয়ে আট দশ জন তো হবেই । ওরা এখন গোলাপ বেঁচে আয় করে । ওদের অভাব ঘুচেছে, ফাহিম তো বোনকে স্কুলে পাঠাতে শুরু করছে ।

ময়মনসিংহ শহরের অভাবগ্রস্তরা অলির কাছে আসে গোলাপ ফোটানোর ট্রেনিং নিতে । অলি তাদের শেখায় কিভাবে চাষ করতে হবে । মাঝে মধ্যে বাসায় গিয়ে দেখিয়ে আসে । অলির ট্রেনিংয়ে এখন অনেকে স্বাবলম্বী । অলিকে সবাই গোলাপ ভাই বলে ডাকে ।

- সাকিব ভাই, চল না আমাদের গোলাপ ফুলের অভিঙতা নিয়ে একটা বই লিখি । অনেক কাজে দেবে, বিশেষত যারা গোলাপের চাষ করতে চাচ্ছে বড় করে ।

সাকিব কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলো । বললো, প্রস্তাবটা খারাপ না । ঠিক আছে, বই লিখবো ।

- আমি জানতাম তুমি রাজি হবে । আমরা বড় করে লিখবো বইটা । গোলাপ চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবি লিখবো । ফাঁকে ফাঁকে গোলাপের ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেবো ।

- ঠিক আছে । আরেকটা কাজ করলে কেমন হয় ? সাকিব বললো ।

- কি কাজ?

- ফুকুসিমাকে প্রজেক্টে নিলে হয় না ? আমরা না হয় তিনজন মিলে বইটা লিখলাম ।

- গ্রেট আইডিয়া সাকিব ভাই, গ্রেট আইডিয়া, এই বলে অলি দাঁড়িয়ে গেল । - পড়ে যাবে অলি ।

- সরি, আমি খেয়াল করিনি । উৎসাহে আবারো অলি দাঁড়িয়ে গেছে ।

- বইয়ের নাম কি দেবে ?

- তুমি বল ।

অলি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, আধুনিক গোলাপের চাষ ।

- নামটা খারাপ না । আরো দুই দিন ভাবি ।

দেখতে দেখতে ওরা অনেক দূর চলে এসেছে । ঘড়ির কাটা রাত দুইটা ছুঁয়েছে । আস্তে আস্তে চাঁদের আলো ফিকে হয়ে এলো । ঘন্টা খানেকের মধ্যে ডুবে যাবে সে ।

নদীর এই দিকটা ভরা কারেন্ট । জোড়েসোড়ে নদী বয়ে যাচ্ছে । থেকে থেকে ঢেউ আছড়ে পড়ছে নৌকার গায়ে । দূরে, অনেক দূরে ছোট ছোট আলো চোখে পড়লো ওদের ।

রহিম মাঝি বললো,

সাকিব ভাই, এবার ফিরে যাই । অনেক দূর চলে এসেছি । এখন না ফিরলে ঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে বেল হয়ে যাবে ।

- ঠিক আছে । অলি, তুমি কি বলো ?

- হ্যাঁ, ফিরে যাই ।

নৌকা ঘুরে গেল । ময়মনসিংহ শহরের দিকে ফিরতে লাগলো ওরা ।

অলির যখন জন্ম হয়, তখন বাংলাদেশে শীতকাল । কুয়াশায় কুয়াশায় ঢেকে আছে ময়মনসিংহ শহর, তখনও ভোর হয়নি । সুরাইয়া বেগম ফুটফুটে ছেলের জন্ম দিলেন । সেই ছেলেকে দেখতে পাড়াপড়শীরা এলো । পরিস্কার ধবধবে চাদরে শিশু অলি শুয়ে আছে, চোখ দুটো বোজা । অলির বাবা হাসেম সাহেব দৌড়ে ইমাম হুজুরকে ডেকে আনলেন । ইমাম হুজুর অলির কানে আজান দিলো । সেই আজানের শব্দে শিশু অলি নড়ে উঠলো ।

ইমাম হুজুর বললেন,

মাশাল্লা, খুব সুন্দর হয়েছে আপনার পোলা । একেবারে পীর-ফকিরগো নুরাণী চেহারা পাইছে ।

হাসেম সাহেব খুশি হয়ে গেলেন ।

- আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন । হুজুর মিষ্টি খান, এই বলে মিষ্টি বেড়ে দিলো হাসেম সাহেব ।

সন্তানের জন্ম আসন্ন জেনে গত রাতে মিষ্টি আনা হয়েছে । কালো জাম, রসগোল্লা, মুক্তাগাছার মন্ডা । দৈও এসেছে কয়েক কাত্রা ।

ইমাম হুজুর হেসে বললেন, আপনার পোলার নাম দিলাম, অলি ।

- অলি মানে কি হুজুর ?

- অলি মানে আল্লার দোস্ত ।

সুরাইয়া বেগমের অলি নামটা পছন্দ হয়েছে । ইমাম হুজুরের নামটাই রেখে দিলো ওরা । তখন আনিছা ছোট, ক্লাস সেভেনে পড়ে । আনিছারও পছন্দ হয়েছে নামটা । অলি বলে ডাকতে শুরু করলো ওরা ।

হাসেম সাহেব রেলে চাকরি করতেন । ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে পোস্টিং হয়েছিল তার । অফিসের পরে বাসায় ফিরে শিশু অলিকে নিয়ে বসতো । যেদিন খুব জোছনা হোত, ছেলেকে নিয়ে বারান্দায় বসতেন হাসেম সাহেব । জোছনার আলো এসে পড়তো অলির গায়ে । সেই আলোতে অলি ঘুমিয়ে যেত ধীরে ধীরে । আনিছা এসে পাশে বসত অলির পাশে তারপর অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকতো ওরা নিষ্পাপ শিশুর দিকে । ঘুমন্ত অলিকে মনে হতো খুদে একটা ফেরেশতা সাদা চাদরে ঘুমাচ্ছে ।

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে । যখন জোছনায় জোছনায় ছেয়ে যায় সারাটা বারান্দা, আনিছার মনে পড়ে বাবার কথা । আজ অলি কত বড় হয়েছে । কত বড় বড় গোলাপ ফোটায় সে । বাবা থাকলে কত খুশি হতেন ।

আনিছা বড় হতে হতেই হাসেম সাহেব হারিয়ে গেলেন । একদিন আনিছারাও হারিয়ে যাবে তারপর আসবে আরেক প্রজন্ম । একদিন তারাও মিলিয়ে যাবে কিন্তু শহরের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে ।

ISBN No. 978-983-43934-0-3

।। চার ।।

বিয়ে

আনিছার আজ বিয়ে । সাকিব আর অলির কাজের শেষ নেই । আনিছাদের বাড়ীর ছাদ ঘেরা দেয়া হয়েছে । সেখানে লোকজন খাবে । বর এসে বাড়ীর ছাদে বসবে, সাথে সকল ছেলেরা । মেয়েরা বসবে নিচতলায় । সামনের বাগানে আলোর ব্যবস্থা হচ্ছে । ছোট ছোট মরিচ বাতি ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ।

ছেলে পক্ষ সব মিলিয়ে চল্লিশজন ঢাকা থেকে আসবে । ছেলের মামা আসবে মুরুব্বী হয়ে । আনিছারা ষাট জন । সব মিলিয়ে একশজনের খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে । অলির বাগানের এক কোণে নান্না বাবুর্চি রান্নার আয়োজন করছে । সেই সকাল থেকে মাঠে নেমেছে সে ।

সাকিব আর অলি বাজারঘাট করলো । সেই সাত সকালে উঠল ওরা । বাবুর্চি যা যা বলেছিলো, ফর্দ মিলিয়ে সব কিনলো । নান্না বাবুর্চি এলো ভোর রাতে । বড় বড় ড্যাগ আর নাড়ানি নিয়ে হাজির ।

অলি বললো, সাকিব ভাই, কটা চেয়ারের অর্ডার দেবো ?
- একশোর মতন দাও । অর্ধেক বসবে নিচে । বাকিগুলো ছাদে ।
বীথি ডেকোরেটরকে বলতে গেলো অলি ।
সুরাইয়া বেগম এসে বললো, সাকিব, শোন ।
- বলো খালা ।
- তোর খালুর খুব শখ ছিলো মেয়ের বিয়েতে ঘরবাড়ী ফুল দিয়ে সাজাবে । একটু ফুল নিয়ে আসতে পারবি ?
- আমি যাচ্ছি খালা । নদীরে ঘাটে ফুলের অভাব নেই, এখনি ফিরবো ।

বরের নাম আমান, ব্যাংকার । বিয়ের পরদিন আনিছাকে নিয়ে রাঙ্গামাটি গেলো । দুদিন থেকে ফিরে এলো ওরা । আনিছার শাশুড়ি খুব খুশি । উনি যে রকম বউ চেয়েছিলেন, তাই পেয়েছেন । প্রতিদিন খাবারের সময় বউকে নিয়ে বসেন ।

বউকে নিয়ে অনেক ঘুরলো আমান । অনেক কিছু কেনাকাটা করলো ওরা । দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল । আমানের ব্যবহার ভালো লাগে আনিছার । খুব ভদ্র ভাবে কথা বলে আমান । একবার আমানের খুব জ্বর হলো । জ্বরে কাহিল হয়ে পড়লো আমান । থেকে থেকে ছটফট করছিলো । আনিছার মনে হল, জ্বরের কষ্ট আমানকে ছাড়িয়ে তার উপর এসে পড়েছে । অনেক চেষ্টা করে জ্বর নামিয়ে আনলো আনিছা । আমানের জ্বর ভালো হলো কিন্তু আমানের মা ভালো হলেন না । তিন দিন ভুগে তিনি মরে গেলেন । মরবার আগে আনিছার হাত ধরে অনেক কাঁদলো । আনিছাও কেঁদে উঠলো ।

একদিন আমান এসে বললো, তোমার সাথে কিছু কথা ছিল ।

- বেশ বলো ।

- কিভাবে বলবো ভাবছি ।

আনিছা হেসে বললো, কিভাবে বলতে চাও ?

- আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি ।

- যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম । এবার হয়েছে ?

- না হয়নি । এটা ক্ষমা চাওয়ার বিষয় না । এটা অন্য কিছু ।

আনিছা খেয়াল করে দেখলো, আমান হাসছে না, ওর মুখ টানটান ।

- ঠিক আছে, এবার বলো, আনিছা বললো ।

আমান বলতে লাগলো,

তোমাকে বিয়ের আগে একটা মেয়েকে ভালবাসতাম । আমাদের পাড়ারই মেয়ে, নাম রুপা । আমার মা বরাবরি রুপাকে অপছন্দ করতো কারণ ওর স্বভাব ভাল ছিল না । প্রথম জীবনে রুপা খুব উচ্ছৃঙ্খল ছিল । আমার সাথে মেশবার পর ও তার ভুল বুঝতে পারে কিন্তু মা কে বোঝানো গেল না । মা গোঁ ধরে রইলেন, এই টুকুন বলে আমান চুপ হয়ে গেল ।

আনিছা বললো, তারপরে কি হলো ?

- এদিকে হঠাৎ রুপার বাবা মারা গেল । বাবার সম্পত্তি নিয়ে ওর ভাইদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হলো, সংসারে নেমে এলো অশান্তি । ওর ভাইরা ওর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগলো । বার বার রুপা আমার কাছে ছুটে আসলো কিন্তু মার জিদের কাছে হেরে গেলাম ।

একটু থেমে আমান আবার বলতে শুরু করলো,

তারপর একদিন রুপার বিয়ে গেলে আমেরিকায় থাকে এক ছেলের সাথে । কিছুদিন পরে রুপা চলে যায় আমেরিকাতে । তারপর থেকে কেমন পাগল পাগল হয়ে গেলাম । রাতে ঘুমুতে পারি না, রাতভর বসে থাকি । ঘুম ভাঙে অবেলায় । প্রতি মুহূর্তে রুপা আমাকে তাড়িয়ে ফেরে । এভাবে দুবছর কেটে গেল । একদিন মা এসে তোমার কথা বললেন ।

- বিয়ে কর, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে । ভুলে যাবে সব কিছু ।

- মার কথায় রাজি হয়ে গেলাম । ভাবলাম সত্যি বুঝি কষ্ট থেকে মুক্তি পাবো ।

টেলিফোনের রিংটনটা অনবরত বেজে চলেছে । আমান গিয়ে ধরলো । কি যেন উত্তজিত হয়ে আলাপ করলো তারপর ফিরে এলো ।

- তুমি আর জানতে চাও না ?

- হ্যাঁ চাই ।

- তারপর তোমাকে বিয়ে করে আনলাম । ভাবলাম সব ভুলে যাব, আবার নূতন করে সাজাবো সবকিছু কিন্তু তা হলো না । যখন তুমি কাছে আস, মনে হয় রুপা আসছে । যখন তোমার হাত ধরি, মনে হয় সেই হাত ।

আনিছা বলে উঠল,

আমি খুব সরি । তোমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি । এটা কেমন করে হলো ? কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে । এখন বলো, তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি ?

আমান কথা বললো না ।

- কই বলছো না যে ?

- আই এম সরি আনিছা । তুমি চাইলেও আমাকে সাহায্য করতে পারছ না । ব্যাপারটা এখন অন্য দিকে গড়িয়েছে ।

- আবার নুতন কি হলো ?

আমান বলতে গিয়ে থেমে গেল । আনিছা দেখলো, আমানের শরীর থর থর করে কাঁপছে । আমানকে শক্ত করে ধরলো আনিছা ।

- আমাকে বলো । আমি যে তোমার ওয়াইফ ।

আমান বলতে শুরু করলো,

গত মাসে রুপার টেলিফোন পেলাম, রুপা জানালো সে এখন ঢাকাতে । দুবছর অনেক চেষ্টা করেছে হাসবেন্ডের সাথে এ্যাডজাস্ট করবার কিন্তু আমার কারণে পারেনি । মার মৃত্যুর খবর পেয়ে দেশে চলে এসেছে রুপা । এখন আমার সাথে আবার সব শুরু করতে চায়, এই বলে আমান চুপ হয়ে গেল । তারপর বললো, আমি তো এখন বিবাহিত । আমি কিভাবে যাই ?

আনিছা বুঝল, তার পায়ের নিচে মাটি সরে গেছে । তার যে আমানের সাথে থাকা হলো না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল ।

আনিছা আর আমান বসে আছে । কখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নেমেছে, কারো খেয়াল নেই । ঘরের বাতি এখনো জ্বালানো হয়নি । বাইরে মোয়াজ্জিনের আজান শুনলো ওরা ।

কি বলবে আমানকে আনিছা ?

- কদিনের জন্য ময়মনসিংহ যেতে চাই । তোমার আপত্তি আছে ?

- বেশ যাও ।

সেই যে আনিছা আমানদের বাড়ী ছাড়লো তার আর যাওয়া পড়েনি । ময়মনসিংহ স্টেশনে সাকিব এলো তাকে নিতে । সুরাইয়া বেগম আনিছাকে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলো । আনিছারও কান্না পেলো কিন্তু ও কাঁদলো না ।

আনিছা বললো, সাকিব ভাই, চলে এলাম । তোমাদের দেয়া বিয়েটা টেকাতে পারলাম না ।

- বেশ তো । সামনের সপ্তাহ থেকে চাকরিতে জয়েন কর । দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে ।

আনিছা হাসলো । কিছু বললো না ।

মাস খানেক হলো আনিছা চাকরিতে জয়েন করেছে । সেই পুরানো কৃষি অফিস । অফিসের অনেকে আনিছার ডিভোর্সের কথা শুনেছে । মুখে কেউ কিছু বলেনি । ইনডাইরেক্টলি অনেকেই সমবেদনা জানিয়েছে । আনিছা আবার কাজে মন দিলো । অফিসের পাশেই ব্রহ্মপুত্র বয়ে চলেছে । নদীর সাথে তাল মিলিয়ে আনিছা কাজ করে যায় সারাদিন ভর ।

মাঝে মাঝে খুব বৃষ্টি নামে, রাস্তা ঘাট বাড়ীর আঙ্গিনা কানায় কানায় ভরে উঠে । শহরের তাপমাত্রা নেমে আসে ধীরে ধীরে । লেপ কাঁথা গায় দিয়ে আনিছারা শুয়ে পড়ে । ঝড় বাদলার রাতে সুরাইয়া বেগম একা থাকতে ভয় পায় । চুপি চুপি আনিছার পাশে এসে শোয় । আনিছা পাশ ফিরে জায়গা করে দেয় ।

রাত বাড়ার সাথে সাথে ঝড় বাদলা বেড়ে চলে । আমানের কথা মনে পড়ে আনিছার । কি শক্ত সুঠাম হাত আমানের । বিয়ের পরপরি ওরা রাঙামাটি গেল । কি সুন্দর সবুজে সবুজে ছেয়ে ছিল উপত্যকা । সেবার খুব বৃষ্টি হয়েছিল । জায়গায় জায়গায় পানি জমে যায় । আনিছাকে শক্ত করে ধরে পানি পাড় করিয়ে দিচ্ছিল আমান । সেই শক্ত হাতের কথা মনে পড়ল আনিছার । খুব কান্না পেল, কাঁদলো না সে । চুপ করে শুয়ে রইলো । জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, হাজারো বৃষ্টির কণা হাজারো শব্দে আছড়ে পড়ছে বাড়ীর ছাদে । *বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীতে এলো বান । খেকশিয়ালের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান ।* সেই শব্দের তালে তালে আনিছার চোখ বুজে আসে । এক সময় ঘুমিয়ে যায় আনিছা । স্বপ্নে দেখলো আমান এসে দাঁড়িয়েছে । তার হাত আগের চেয়ে আরও টানটান । এগিয়ে গেল আনিছা । আমানের কাছে আসতেই রুপা এসে দাঁড়ালো । আমানকে জাপটে ধরলো পেছন থেকে তারপর ওরা হেসে উঠল । ওদের হাসিতে ভরে উঠলো জায়গাটা ।

প্রায় আনিছা ভাঙাভাঙা স্বপ্ন দেখে । বেশির ভাগ স্বপ্নের কোন মানে নেই, বিচ্ছিন্ন সব স্বপ্ন । আজও আনিছার ঘুম ভাঙল বিচ্ছিড়ি একটা স্বপ্ন দেখে । উঠে বসল আনিছা । বর্ষা পেরিয়ে শীত পড়তে শুরু করেছে সারা শহরে । আনিছাদের টিনের চালে শিশির পড়ছে টিপ টিপ করে । অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করলো আনিছা । ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো সকাল চারটা । একটু পরেই ভোর হবে । কম্বলটা সরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো । সারাটা বারন্দা কুয়াশায় ঢেকে আছে । আনিছার মনে হলো, আজ বাবা থাকলে তাকে সব বলতো তারপর বাবার কাঁধে সব চাপিয়ে ঘুমাতে যেত ।

বারান্দায় সব সময় একটা বেতের চেয়ার পাতা আছে । যে কেউ বিশ্রাম নিতে পারে । হাসেম সাহেব চেয়ারটায় এলিয়ে বসতেন । আনিছা এসে পাশে বসতো । মাঝে-সাঝে গল্প হতো আবার অনেক সময় চুপচাপ বসে থাকত ওরা তারপর সুরাইয়া বেগমের ডাক পড়লে ওরা খেতে যেত ।

গা এলিয়ে বসেছে আনিছা সেই চেয়ারে । আকাশে আজ জোছনা নেই, কেমন থম থমে । সারাটা আকাশ অন্ধকারে ঢেকে আছে আর তারি নিভৃতে হাজারো নক্ষত্র দপ দপ করে জ্বেলে চলেছে । পাশের ঘরে অলি ঘুমিয়ে আছে । তার লাগোয়া ঘরে সুরাইয়া বেগম । ওদের ডাকলো না আনিছা । আজ সে একাই নক্ষত্রের সাথে মিতালি করবে ।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়লো আনিছার । একবার নৌকা দৌড়ের প্রতিযোগিতা হবে ব্রহ্মপুত্রে । সারা শহরে মাইকিং করেছে ওরা । ভোর না হতেই হাসেম সাহেব বের হলেন, সাথে অনিছা । তখন আনিছা ক্লাস সিক্সে পড়ে, অলি তখনো হয়নি । ওরা গিয়ে নদীর ঘাটলায় বসলো । এখান থেকে নৌকা দৌড় হবে । ওরা গিয়ে দেখলো অনেকে এসেছে এরি মধ্যে । আনিছা দেখলো, সাত-আটটা নৌকা পাশাপশি ভেসে আছে । কেমন লম্বাটে আর চোখা । এ রকম সাইজের নৌকা কখনো দেখেনি আনিছা । প্রতি নৌকায় সাত-আটজন মাঝি-মাল্লার । সবারি মাথা লাল কাপড়ে বাঁধা । মস্ত বড় তবলা ঢোল বসেছে নৌকার মাথায় ।

- বাবা, এই ঢোল তবলা দিয়ে কি হবে ?

হাসেম সাহেব হেসে বললেন, যখন নৌকা চলতে শুরু করবে, তখন মাঝিরা ঢোলের তালে তালে বৌঠা ফেলবে । এক সাথে বৌঠা ফেলতে না পারলে যে নৌকা জোরে যাবে না ।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাক-ঢোল বাজতে শুরু করলো । সেই ঢাক-ঢোলের তালে তালে নৌকাগুলো ছুটতে শুরু করেছে । প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর ওদের গতি ডাবল, তিন ডবলে ঠেকলো । আনিছার মনে হলো কতগুলো বর্শা তীর বেগে এগিয়ে চলেছে । সেই ঢোলের তালে তালে নদীর দুই পাড়ে দর্শকেরা উৎসাহ যুগিয়ে চললো ।

খুকু

বিকেল পাঁচটা বাজতে খুকু এসে হাজির । আনিছা জিজ্ঞেস করলো,

- কি খুকু, মন খারাপ ?

- ক্লাসে পড়া পারিনি । আপা খুব বকেছে, এই বলে মেয়েটা কেঁদে উঠলো প্রায় ।

আনিছা এসে ওর গায়ে হাত দিলো ।

খুকু বললো, সারোয়ার আপা খুব রেগে ছিলেন । আমার পাশের বেঞ্চের কনাকে খুব বকলো ফলে আমি কবিতাটা ভুলে গেলাম । এই দেখ কেমন বলতে পারছি, এই বলে কবিতাটা মুখস্থ বললো খুকু ।

আনিছা বললো, কিছু খাবে খুকু ?

- পানি খাবো ।

- দাঁড়াও দিচ্ছি । জগ থেকে পানি ঢেলে দিল আনিছা ।

- জান আপা, আমাদের হেডমিস্ট্রেস আনোয়ার আপা দেখতে তোমার মতন ।

- তাই নাকি ?

- একদম তোমার মতন । হাসলে মনে হয় তুমি ।

আনিছা হেসে বললো, তাহলে তো আনোয়ারা আপাকে দেখতে হয় ।

- প্রতিদিন আপা বড় বাজারের উপর দিয়ে যায় । তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে পাবে । যদি বল কাল আমি সকাল সকাল চলে আসবো তারপর দুজন মিলে দেখবো ।

আনিছা বললো, কাল না অন্যদিন । কাল যে আমার অফিস ।

খুকু একটু চিন্তা করে বললো, তাহলে শুক্রবার । সেদিন তো তোমার অফিস নেই ।

- সেদিন তো তোমাদের স্কুলও বন্ধ ?

- না । সেদিন আমাদের স্পোর্টস । আনোয়ারা আপা আসবেন ।

- ঠিক আছে, তুমি সকাল সকাল চলে এসো । আমার দুজন মিলে দেখবো ।

- অলি ভাই কোথায় আনিছা আপা ?

- ঐ তো বাগানে । তুমি যাও, আমি আসছি ।

অলি বললো, এই তোর কি হয়েছে রে ?

- আপা বকেছে ।

- কোন আপা ?

- সারোয়ার আপা ।

- কেন ?

- ঠিক মতন কবিতা বলতে পারিনি ।

তাই, বলে অলি হেসে দিল ।

- কোন কবিতাটা ?

- সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে ...

- তুই তো একবার বকা খেলি । আমি অনেক খেয়েছি তারপরেও স্যারদের ভাল লাগে । যাইহোক, তোর মন ভাল করে দেই । দেখ কত্ত বড় গোলাপ, আমি আর সাকিব ভাই ফুটিয়েছি ।

খুকু দেখলো ঢাউস আকারের একটা গোলাপ । পাপড়িগুলো কেমন বড় বড় আর মজবুত । লালে লালে সিক্ত হয়ে আছে গোলাপটা । এই প্রথম এতো বড় গোলাপ দেখলো খুকু । সহসা মনটা ভাল হয়ে গেল । সারোয়ার আপার কথা ভুলে গেল সে ।

- তুই নিতে চাস ?

গোলাপটা নিতে খুকুর প্রাণ ছিড়ে যাচ্ছিল কিন্তু বললো না সে কথা ।

- থাক লাগবে না ।

- তোর নাক মুখ বলে দিচ্ছে তোর লাগবে । দাঁড়া, আমি সাকিব ভাইকে জিজ্ঞেস করে আসি, এই বলে অলি লাফ দিয়ে সাকিবদের বাড়ী গেল । রাস্তার ওপারে সাকিবদের বাড়ী । কিছুক্ষণ পর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো ।

- সাকিব ভাই পারমিশন দিয়েছে তবে গোলাপটা ছেড়া যাবে না । টব সহ নিতে হবে । মাঝে-সাঝে আমরা গিয়ে দেখে আসব ।

খুকুর মুখে আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো । সে ভাবেনি সে গোলাপটা পাবে ।

- তোমাকে অনেক ধন্যবাদ অলি ভাই । মা দেখলে খুব খুশি হবে ।

- ধর এই টবটা ?

খুকু হাত বাড়িয়ে দিল । অলি দেখলো, ডান হাতের তালু বেয়ে ক্রমেই সাদা চামড়া উপরে উঠে আসছে । এখন হাতের গোড়ালি পর্যন্ত এসছে । অচিরেই ঢেকে দেবে সারাটা হাত । মনটা খারাপ হয়ে গেল অলির ।

অলির সাথে খুকুর পরিচয় হয় স্কাউটিং করতে গিয়ে । একবার স্কাউটদের ক্যাম্প বসেছিল ময়মনসিংহ শহরে । ব্রহ্মপুত্রের পাড় ঘেষে ওরা টেন্ট ফেলেছে, তিন দিন চলবে স্কাউটিং । সারাদিন নানা এ্যাকটিভি থাকতো ওদের । সেই ক্যাম্পে অলি একটা ইংরেজী গান গেয়েছিল । গ্রাম, গঞ্জ আর বুনো পাহাড় নিয়ে গান । গানের ভাষা আর সুরের সাথে ব্রহ্মপুত্র একাকার হয়ে গেল । সবাই মন দিয়ে শুনলো গানটা । গানের শেষে সবাই গুনগুন করে গাইতে লাগলো । সবার অনুরোধে অলি আবারও গাইলো ।

খুকু এগিয়ে এসে বললো, আমি খুকু । আপনার গানটা আমাদের ভাল লেগেছে । গানের লাইনগুলো পেতে পারি ?

- নিশ্চয় । লাইনগুলো লিখে দিলো অলি । খুকু আর তার বন্ধুরা গুনগুন করে গাইতে লাগলো ।

একদিন বিদ্যাময়ী স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময় অলি দেখলো খুকু বাড়ী ফিরছে ।

অলি বললো, কেমন আছেন ?

- ভাল । আপনি ?

- ভাল ।

খুকু বললো, আপনার গানটা এখনো গাই, *Country roads, take me home to the place....*

- আলি হাসলো তারপর বললো, আপনি কোথায় থাকেন ?

- বড় বাজারে ।

- আমিও তো বড় বাজারে থাকি । কৈ আপনাকে তো কখনো দেখিনি ?

খুকু বললো, আমিও দেখিনি আপনাকে ।

- আপনি কি বিদ্যাময়ীতে পড়েন ?

- জি, ক্লাস নাইনে । আপনি ?

- জিলা স্কুলে । আগামী বছর ম্যাট্রিক দেবো । একদিন আসুন না আমাদের বাসায় । আনিছা আপুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেব ।

- আনিছা আপু কে ?

- আমার বড় বোন । ব্যাংকে চাকরি করে । সবাইকে ভালবাসে ।

এভাবে অলির সাথে খুকুর পরিচয় তারপর থেকে ওদের সম্পর্ক । অলির মেধা আর সৃজনশীলতা দেখে খুকুর বাড়ীর লোকেরা কিছু বলে না । অলিকে ওরা সম্মান করে । অলিদের বাড়ীতে খুকু আসে । সুরাইয়া বেগম খুকুকে পছন্দ করেন । কোন সমস্যা হলে খুকুর ডাক পড়ে অলিদের বাড়ীতে ।

© Shesh Ratteer Josna by Sayed Hossain 2008

।। ছয় ।।

লোকটা

গভীর বৃষ্টি হচ্ছে মধ্যরাত থেকে । সারাটা শহর বৃষ্টির পানিতে আলুথালু । বৃষ্টির গর্জনে অলির ঘুম ভাঙলো । ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছে সে । অলিদের টিনের চালে নিরন্তর বৃষ্টি ঝরছে । অলির মনে পড়লো লোকটার কথা । একটা লোককে রেলস্টেশনে রেখে এসেছে ও ।

আজ সকালে হাঁটতে গিয়ে অলি দেখলো একটা লোক শুয়ে আছে রাস্তার ধারে । গায়ে জ্বর, হালকা হালকা শ্বাস ফেলছে লোকটা । বয়স পন্চাশের কাছাকাছি, গ্রাম থেকে এসেছে বোধহয় । জ্বরের কারণে আর ফিরতে পারেনি ।

অলি লোকটাকে রেলস্টেশনের বিছানায় শুইয়ে দিল । পাশেই সরকারি ডিসপেনসারি । সেখানে থেকে ডাক্তার নিয়ে এলো । একগাদা ঔষধ লিখে দিল ডাক্তার । অলির কাছে কিছু টাকা ছিল । আজ সকালে বৃত্তির টাকা পেয়েছে, তা দিয়ে ঔষধ আর খাবার কিনলো ।

খাবার আর ঔষধ খেয়ে লোকটা অনেক সুস্থ হলো । জ্বরটা কমে এসেছে । লোকটা বললো, তুমি কে ?
- আমি অলি ।
- কি করো ?
- স্কুলে পড়ি । এবার ম্যাট্রিক দেব জিলা স্কুল থেকে ।
- ভাল । আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক ।
- আপনি কোথা থেকে আসছেন ?
- নদীর ওপাড় থেকে । হঠাৎ করে জ্বরে পড়ে গেলাম তাই ফিরতে পারি নি ।

বিকেলে ডাক্তার ইনজেকশন দিলো লোকটার ডান হাতের শিরায় । অলি দেখলো, কি মসৃন হাত । খুকুর কথা মনে হলো ওর । ডান হাত বেয়ে ক্রমেই সাদা চামড়া উপরে উঠে আসছে ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো অলি । বৃষ্টির কারণে শহরের তাপমাত্রা নামতে শুরু করেছে । লোকটা নিশ্চয় শীতে কাঁপছে স্টেশনের চত্বরে । বিকেল বেলা হালকা কাঁথা দিয়ে এসেছিল অলি । সেটা যে যথেষ্ট না, নিজের গায়ে জড়ানো কম্বল দেখে বুঝলো । সারাটা স্টেশন খোলা, হু হু করে বাতাস ঢুকছে চারিদিক থেকে ।

সুন্দর করে কম্বলটা পেঁচালো অলি যেন বৃষ্টিতে ভিজে না যায় তারপর বেরিয়ে পড়লো । রাত তখন দুটো, কম্বল মুড়ে সারা শহর ঘুমাচ্ছে । বৃষ্টি ঝরছে সারা শহর জুড়ে ।

বাইরে বৃষ্টির দাপাদাপি অনেক বেশি, যা ঘর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না । রাস্তায় নামতে এক ঝাক বৃষ্টি অলিকে আকড়ে ধরলো । রাস্তায় কোন রিকশা চোখে পড়লো না । বড় ছাতাটা মেলে ধরলো অলি । হাঁটা দিলো স্টেশন বরাবার, ডান কাধে ঝুলিয়ে দিলো মোটা কম্বলটা ।

পনের মিনিটের হাঁটা পথ । ব্রহ্মপুত্রের পাড় ঘেষে ডানে মোর নিয়ে সোজা স্টেশন । বায়ে ব্রহ্মপুত্র, সারাটা নদী জুড়ে ঝড়ে চলেছে ভারী ফোঁটার বৃষ্টি । লাইটপোস্টের আলো এসে পড়েছে বৃষ্টির গায়ে । সেই আলোতে বৃষ্টির দানাগুলো স্ফটিকের মতন ফুটে উঠল ।

স্টেশনে পৌছতে পৌছতে রাত সোয়া দুটো । স্টেশনে ঢুকে অলি দেখলো লোকটা পা তুলে বসে আছে । সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে । লোকটার গায়ে কম্বল চাপিয়ে দিল অলি । বাসা থেকে আনা বিস্কুট খেতে দিল । বিকেল বেলা আনিছা বড় বড় পিঠা ভেজেছিল । আসবার সময় কয়েকটা কোমরে গুজে এনেছে । খেতে দিল লোকটাকে । সবার শেষে ঔষধ খেলো লোকটা ।

জ্বর নামতে শুরু করেছে । আধ-ঘন্টার মধ্যে নেমে এলো । অলিকে পাশে পেয়ে লোকটা খুব ভরসা পেলো । বললো,

- এই ঝড় বাদলা মাথায় নিয়ে কেমনে এলে ?

- আমার বাসা কাছেই । হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি ।

- তুমি আমার পোলা । আজ থেকে তুমি আমার পোলা, এই বলে লোকটা কেঁদে ফেললো ।

অলি কিছু বললো না ।

- কেমন লাগছে আপনার ?

- ভাল । এই দেখ একদম জ্বর নাই, এই বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল ।

অলি দেখলো, কি মসৃন হাত । পুরু চামড়ায় ঢাকা ।

- তোমার বাবা মা নাই ?

- মা আছে, বাবা নাই । বর বোন আছে, নাম আনিছা ।

- আর কে আছে ?

- সাকিব ভাই ।

- সাকিব ভাইটা কে ?

- আমার খালাতো ভাই । আমার শিক্ষক ।

- কি করেন ?

- আনন্দ মোহন কলেজের শিক্ষক । খুব ভাল ইংরেজী জানেন । এই যে আপনার কাছে ঝড়বাদল মাথায় নিয়ে এলাম, তা সাকিব ভাই শিখিয়েছেন ।

- তুমি ভাগ্যবান মিয়া । এমন শিক্ষকরে মাথায় নিয়ে রেখো ।

- সাকিব ভাইকে মাথায় নিয়ে রাখতে চাইলেও রাখা যায় না । উনি বাড়তি সম্মান পছন্দ করেন না ।

লোকটা আর কথা বাড়ালো না । চুপ হয়ে গেল ।

।। সাত ।।

শুক্রবার

সকাল থেকে হালকা হালকা মেঘ । এখন বৃষ্টি না নামলে রাতে যে নামবে সেটা বলে দেয়া যায় । এখন সকাল নয়টা । আনিছা উঠে নাস্তা রেডি করলো । আজ ছুটিছাটা, বাসায় সারাদিন কাটাবে আনিছা ।

অলি এসে বললো, আপু, নাস্তা কি এখন খাবো ?
- এখনি খাবে । পাউরুটি ছেঁকেছি, ডিমের মামলেট করেছি ।
খুশি হয়ে গেল অলি । চল খাই তাহলে । আমার ক্ষুদা পেয়েছে ।
খেতে বসলো ওরা ।
অলি বললো, Helen of Troy কেমন দেখলে ?
- ভাল । তুমিতো যেতে পারলে না পরীক্ষার জন্য । গ্রীক আর ট্রয়দের যুদ্ধ দেখালো । গ্রীক রাজকন্যা হেলেন, ট্রয় যুবরাজের হাতে ধরে ট্রয়ে চলে যায় । সেই হেলেনকে ফিরিয়ে আনতে গ্রীকরা ট্রয় আক্রমন করে । সে যুদ্ধ চলে বহু বছর । শেষমেষ গ্রীকদের জয় হয়, ওরা হেলেনকে দেশে নিয়ে আসে ।
অলি বললো, ট্রয় যুবরাজের হাত ধরে হেলেন ট্রয়ে চলে যায়, কথাটা সত্যি নাও হতে পারে ।
- কেন সত্যি হবে না ?
- এ নিয়ে হিসটোরিয়ানদের মধ্যে দুই মত আছে । এক ভাগ মনে করে, হেলেন স্বেচ্ছায় ট্রয়ে যায়নি । ওকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফলে বেধে যায় যুদ্ধ ।
আনিছা প্রতিবাদ করতে নিয়ে করলো না । আনিছা জানে সাকিব অলির শিক্ষক । সাকিবের দেয়া তথ্য ভুল হবে না ।

আনিছার মনে হলো অলি তাদের বাবার মতন হয়েছে । হাসেম সাহেব পড়াশুনা ভালবাসতেন । নিজের ছেলেমেয়ে, আত্মীস্বজন ও পাড়া-পড়শীড়ারা যেন লেখাপড়া করতে পারে তার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন । লেখাপড়া না করিয়ে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে তিনি বাদ সাদতেন ।

হাসেম সাহেব বলতেন, তোমার মেয়ে বিএ পাশ করেছে ?
- না করেনি । আগামী বছর পরীক্ষা দেবে ।
- আগে পরীক্ষা দিক, পাস করুক তারপর বিয়ে দিও । মেয়েকে স্বাবলম্বী হতে দাও । খুদা না করুক, জামাই বাবুর কিছু হলে ছেলেপুলে নিয়ে কই দাড়াবে মেয়েটা ?
অনেকে হাসেম সাহেবের কথা শুনতো, আবার অনেকে হেসে চলে যেত ।

অলি তার বাবার মতন হয়েছে । পড়াশোনা ভালবাসে । সাকিব যা যা পড়ে, অলিও পড়ে ফেলে সেসব । খুব মনোযোগ দিয়ে সাকিবের কথা শুনে অলি । এই অল্প বয়সে অনেক শিখে ফেলেছে অলি । ইংরেজী সাহিত্যের হাতে খড়ি এই সাকিবের হাত ধরে ।

অলি বললো, আজ সারাদিন কি করবে ? আজ-কাল তো তোমার ছুটি ।
- দেখি কি করা যায় । প্রথমে জামা-কাপড়গুলো ধুয়ে ফেলি । এই যা, বাইরে যে বৃষ্টি । শুকাবে তো ?
- বৃষ্টি চলে যাবে আপু ।
- কিভাবে বুঝলে ?
- তুমি দেখ, দূরের মেঘগুলো কেমন হালকা হয়ে উঠছে ।
আনিছা মাথা বাড়িয়ে দেখলো, সত্যি তাই । বললো,

তাহলে জামা-কাপড় ধুয়ে ফেলি । ঘরবাড়ীও সাফ করি । আমাকে সাহায্য করবে ?
অলি একটু চিন্তা করে বললো, ঠিক আছে । তার আগে একটা জিনিষ সাকিব ভাইকে দিয়ে আসি, এই বলে অলি দৌড়ে গেল ।
সুরাইয়া বেগম এসে বললেন, কি হয়েছে তোদের এই সাত সকালে ?
- না কিছু না । একটু ঘরবাড়ী গুছাচ্ছি ।

সবার প্রথমে আনিছা হাসেম সাহেবের ছবিটা মুছলো । কি সুন্দর করে তার বাবা হাসছে । অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আনিছা । মনে মনে বললো, বাবা আমি মাস্টার ডিগ্রী পাশ করেছি, এখন চাকরি করি । তোমার যে স্বপ্ন ছিল, তোমার মেয়ে স্বাবলম্বী হবে, তা হয়েছে । তুমি তো দেখতে এলে না ?

একটু পরে অলি ফিরে এলো । বললো, বলো কি করতে হবে ?

- চেয়ারগুলো ধরো । ঝেড়ে মুছে ফেলি, এই বলে আনিছা ঝাড়তে লাগলো ।

অলি বললো, তোমার মনে পড়ে তুমি যে একবার ব্রহ্মপুত্রে ডুবে গিয়েছিলে ?

আনিছা কাজ থামিয়ে বললো, হ্যাঁ মনে পড়ে । কেন, কি হয়েছে ?

- তোমার কেমন লাগছিলো তখন ?

আনিছা হেসে বললো,

সে এক ভয়ানক ব্যাপার । যেহেতু সাঁতার পারতাম না, নদীতে পড়েই ডুবতে শুরু করলাম । ধীরে ধীরে কান ভারি হয়ে এলো । এক পর্যায়ে আর শ্বাস নিতে পারছিলাম না । হঠাৎ একটা হাত আমাকে আকড়ে ধরলো, তারপর হেঁচকা টানে তুলে আনলো উপরে ।

- সে লোকটা সাকিব ভাই, তাই না ?

- ঠিক তাই । ঐ দিন সাকিব না থাকলে তোমার সাথে আর গল্প হতো না । বাবার দেশে চলে যেতাম । আচ্ছা, তুমি তো অনেক পড়াশুনা কর, মৃত্যু জিনিষটা কি ?

অলি চুপ হয়ে গেল ।

- কি বলবে না ?

- বলবো । একটু দাঁড়াও । ভেবে দেখি ।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে অলি বললো,

মৃত্যু মানে আমাদের জীবন চক্রের যে কোন একটা ধাপ অতিক্রম করা ।

- এর মানে কি ?

- এর মানে হলো, আমাদের জীবন চক্র কখন শুরু হয়েছে, তা জানা নেই আবার কখন শেষ হবে তাও পরিষ্কার না ফলে জীবনের আদি-অন্ত মানুষের অজানা । মৃত্যু হলো সেই চলমান জীবনের একটা ঘটনা । এই ঘটনাটা ঘটে জীবন চক্রের কোন এক জায়গায় গিয়ে কিন্তু কখন ঘটবে বা কেন ঘটবে তা জ্ঞানের অতীত ।

অলির জবাব শুনে আনিছা চুপ হয়ে গেল । আনিছা বুঝলো, অল্প বয়সে অলি অনেক শিখে ফেলেছে । তাদের বাবা থাকলে খুব খুশি হতেন ।

।। আট ।।

ইন্জিনিয়ার সাহেব

অফিসে বেলা দুটো । সবে মাত্র লান্চ আওয়ার শেষ হয়েছে । সবাই যার যার ডেস্কে ফিরে গেছে । প্রতিদিন আনিছা বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসে । জোহরের নামাজ পড়ে খেয়ে নেয় তারপর ফিরে যায় ডেস্কে ।

- সাহেব ডাকছেন । পিয়ন এসে খবর দিয়ে গেলো ।

করিম সাহেব এখানকার ম্যানেজার । বয়স পন্চাশের কাছাকাছি । কাঁচা পাকা দাড়ি আছে । খুব ফিটফাট হয়ে অফিসে আসেন । সবাই পছন্দ করে করিম সাহেবকে ।

করিম সাহেবের রুমে ঢুকলো আনিছা । করিম সাহেব কথা বলছেন । সামনে এক গাদা ফাইল । টেবিলের আরেক প্রান্তে এক ভদ্রলোক বসে আছেন । কড়কড়ে মার দেয়া ইস্ত্রি করা পোশাক । ঘরে ঢুকতেই পারফিউমের গন্ধ নাকে এলো আনিছার ।

করিম সাহেব বললো, বসুন, । আপনি ভালো তো ?

- জি স্যার ।

- শম্ভুগন্জ গিয়েছিলেন প্রজেক্টের কাজে ?

- না স্যার, শেষমেষ যাওয়া হয়নি । ওরা কাল যেতে বলেছে ।

- ঠিক আছে, কাল যাবেন কিন্তু যাবার সময় আপনার দুই এ্যাসিসট্যান্টকে নিয়ে যাবেন । ওরা কাজটা বুঝে আসবে যেন আপনাকে দৌড়াদৌড়ি করতে না হয় । ওরাই প্রতিদিন যাবে । আপনি মাঝে-সাঝে গিয়ে দেখে আসবেন, এই বলে করিম সাহেব একটু থামলেন । তারপর বললেন,

এবারের কৃষি ঋনটা অনেক বড় তাই নিবিড় ভাবে সুপারভাইজ করতে হবে যেন কৃষকেরা ঠিক ভাবে ঋণ পায় ।

- আমি সাধ্য মতোন দেখবো স্যার ।

- ও হ্যাঁ, যে জন্য আপনাকে ডেকেছি । ইনি জাহেদ সাহেব, আমেরিকা থেকে এসেছেন । ক্যালিফোর্নিয়ায় এক NGO তে চাকরি করেন । সিভিল ইন্জিনিয়ার । বাংলাদেশে এসেছেন প্রজেক্ট নিয়ে । কৃষি দপ্তর থেকে আমাদের অনুরোধ করা হয়েছে, আমরা যেন উনাকে সাহায্য করি । জাহেদ সাহেবের ভার আমি আপনাকে দিতে চাই, কি বলেন ?

- জি স্যার, আমি দেখবো ।

- তাহলে উনাকে আপনার রুমে নিয়ে যান তারপর আলাপ করে দেখেন কিভাবে উনাকে সাহায্য করা যায় ।

- প্লিজ, আসুন আমার সাথে, আনিছা বললো ।

করিম সাহেব বললেন,

ইনি মিস আনিছা, সিনিয়র রুরাল ক্রেডিট অফিসার । আশা করি আপনাকে আনিছা সাহায্য করতে পারবে । এর পাশাপাশি আমরা তো আছি ।

জাহেদ সাহেবকে রুমে নিয়ে এলো আনিছা । অফিসের শেষপ্রান্তে আনিছার অফিস রুম । হালকা করে ঘেরা দেয়া । পাশের রুমে আনিছার দুই এ্যাসিসট্যান্ট বসে ।

- বসুন, আনিছা হালকা করে বললো ।

জাহেদ সাহেবে চেয়ারে আরাম করে বসল তারপর বিশাল হাসি দিয়ে বললো, আপনাকে ঝামেলায় ফেলে দিলাম ।

- না ঝামেলা বলছেন কেন ? এ সবি তো আমাদের কাজ । আপনি বাংলাদেশে প্রজেক্ট নিয়ে এসেছেন, এ তো আমাদেরি লাভ বরন্চ আপনাকে কষ্ট করে পরে থাকতে হবে এই গরমের দেশে ।

তারপর একটু থেমে আনিছা জানতে চাইলো, আপনার কখনো ময়মনসিংহ আসা হয়েছে ?

- না, এবারই প্রথম । ঘুরে ফিরে দেখলাম । দুই এক রাস্তায় শহর শেষ । আমার সব চেয়ে ভাল লাগে যখন দেখি রাত নটার পর শহর ঘুমিয়ে যায় ।

আনিছা বললো,

আমরা সেভাবেই অভ্যস্ত । রাত আটটা বাজতেই ডিনার শেষ । দশটার মধ্যে শুয়ে যাই । ঘুম থেকে উঠি সেই ভোরে । বিদেশে যেমন রাতবিরেতে নানা জায়গায় যাওয়া যায়, এখানে সে সুযোগ নেই তাই শহরের লোকেরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে । সে যাই হোক, আপনি কোথায় উঠেছেন ?

- সরকারি কোয়ার্টারে । একেবারে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে ।

- খাওয়া দাওয়া কোথায় করছেন ?

-কোয়ার্টারে বেয়ারা বাবুর্চি দেয়া আছে । ওরাই রান্না করে । এতো সরকারি খাতির পাবো, ভাবি নি ।

- চা খাবেন ?

- দিন ।

দেখতে দেখতে চা বিস্কুট এলো । সেই সাথে মুক্তাগাছার মন্ডা ।

- প্লিজ নিন, এই বলে আনিছা চা, মন্ডা এগিয়ে দিল । বললো, এবার বলুন আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি ।

জাহেদ বলতে শুরু করলো,

করিম সাহেবের কাছে শুনেছেন, আমি ক্যালিফোনিয়ায় এক NGO তে চাকরি করি । আমরা বাংলাদেশে একটা প্রজেক্ট করবো । ভূমিহীনদের জন্য ঘরবাড়ী বানাবো । সেখানে প্রতি ভূমিহীন পরিবারকে তিন রুমের বাড়ী দেবো পনের বছরের জন্য । পনের বছরের পর বাড়ী ছাড়তে হবে । আশা করি এই পনের বছরে ওরা দাঁড়িয়ে যাবে তারপর সেই বাড়ী আরেক ভূমিহীনকে দেয়া হবে । এভাবে আমরা প্রাথমিক ভাবে এক হাজার পরিবারকে আশ্রয় দেবো ।

- এক হাজার ? এ যে বিশাল কর্মকান্ড । তো আপনাদের প্রজেক্ট লোকেশনটা কোথায় ?

- ময়মনসিংহ শহরের ওপারে । ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেষে এই আবাসন প্রকল্প । বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় জমি সরবরাহ করবে ।

- বেশ ভালো । তো এখানে আমাদের কাজটা কি ?

- যেহেতু আপনারা দরিদ্রদের নিয়ে কাজ করেন, আপনারা ভালো জানবেন কারা সত্যিকারের ভূমিহীন । সেই ভূমিহীনদের একটা লিস্ট আমার চাই ।

আনিছা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো, সে রকম একটা লিস্ট আমাদের আছে । আপনাকে দেয়া যাবে ।

জাহেদ বললো,

আমার কাজ হবে এই লিস্টটা সংগ্রহ করা তারপর কি ভাবে আবাসন প্রকল্প হবে, তা খতিয়ে দেখা । যেমন ধরুন, কি পরিমান জমি লাগবে, লোকেশনটা কোথায়, সয়েল টেষ্ট করা, কি পরিমান খরচ হতে পারে তার একটা মোটামুটি ধারণা নেয়া তারপর ক্যালিফোর্নিয়াতে রিপোর্ট করা । আপনাদের সহজে ছাড়ছি না । এক বছরের জন্য আমি এসেছি ।

আনিছা হেসে বললো,

আমাদের নাইবা ছাড়লেন তবে আপনার কাজটা দারুণ । আমার তো রীতিমত হার্ট বিটিং বেড়ে গেছে । কত মানুষের যে থাকবার জায়গা নেই । আমার সাথে ঘুরলে বুঝতে পারবেন ।

- এ দেশের মানুষ গরিব কেনো মিস আনিছা ?

- এক কথায় উত্তর দেবো ?

- বেশ বলুন ।

আনিছা বলতে লাগলো,

আমরা গরিব কারণ আমরা কৃষির উপর দাঁড়িয়ে । যে দেশ যত বেশি কৃষি নির্ভর, তার দারিদ্রটা তত বেশি । এর কারণ হলো কৃষি খাদ্য বেচে খুব একটা লাভ করা যায় না । আপনি খেয়াল করে দেখবেন, যে হারে কৃষিখাদ্যের দাম বেড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে সার, পানি, কিটনাশকের দাম । তাহলে লাভটা হচ্ছে কোথায় ? তাই কৃষকেরা গরিব-ই থেকে যাচ্ছে ।

এই বার জাহেদ হেসে বললো,

আপনি তো কৃষি-অর্থনীতিবিদ । আপনার এসব ভাল জানা থাকবে । বাংলাদেশের কৃষি নিয়ে অনেক কিছু জানা যাবে আপনার কাছ থেকে ।

আনিছা হেসে বললো, আপনি তো আমাকে উপরে তুলে দিলেন । এখন নামবো কিভাবে তাই ভাবছি ।

- আপনার নামতে হবে না, উপরেই থাকুন । তারপর বলুন,

বাংলাদেশে ঠিক কারা ভূমিহীন এবং কিভাবে ব্যাপারটা ঘটে ?

- বাংলাদেশে কারা ভূমিহীন, এটা বলা মুশকিল না জাহেদ সাহেব । আপনি খেয়াল করে দেখবেন এদেশে গ্রামীণ পরিবারের সাইজ কিন্তু বেশ বড় অন্ততঃ শহরের পরিবারের তুলনায় তো বটেই । প্রতি পরিবারে গড়ে পাঁচ-ছয়জন পাওয়া যাবে । এদের বাবা যখন মারা যায়, তখন পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায় পাঁচ ছয় জনের মধ্যে । ফলে একেক জনের ভাগে খুব কম পরে । এরা আবার বিভিন্ন অভাব অনটনে পরে এদের অংশ বিক্রি করে দেয় ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়ে । অনেকে আবার চাষাবাদের জন্য গ্রামের মহাজনদের কাছে উচ্চ সুদে জমি বন্ধক রেখে ঋণ নেয় । সুদের হার এতো বেশি যে, কৃষক সেই ঋণ শোধ দিতে পারে না ফলে জমি হাতছাড়া হয়ে যায় । কৃষক হয়ে পরে ভূমিহীন ।

জাহেদ বললো,

সে ক্ষেত্রে আপনারা কেন কম সুদে ঋণ দিচ্ছেন না ? প্রায় শোনা যায় আপনাদের ঋণ পেতে কৃষকদের অনেক অপেক্ষা করতে হয় ।

- আপনার অভিযোগ অস্বীকার করছি না । আমাদের অনেক দূর্বলতা আছে । সেজন্য এদেশের মহাজনেরা অনেক বেশি সুবিধে করতে পারে তারপরেও আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ঋণ দেবার ।

জাহেদ বলে উঠলো,

মার্কিন মুল্লুকে কিন্তু সে দেশের সরকার কৃষকদের সাবসিডি দিয়ে থাকে যেন ওরা কৃষি কাজ অব্যাহত রাখে । এই সাবসিডি দিতে সরকারকে বাজেটের একটা অংশ ব্যয় করতে হয় ।

- আপনারা চাইলে কৃষিতে সাবসিডি না দিয়ে তৃতীয় বিশ্ব থেকে কৃষিপণ্য কিনতে পারেন ?

- হ্যাঁ পারি কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ঝুঁকির মধ্যে পরতে হয় ?

- কি রকম ঝুঁকি ?

জাহেদ বলতে লাগলো,

যেমন ধরুন, আমাদের সাথে এমন দেশের যুদ্ধ বেধে গেল, যারা আমাদের খাদ্য যোগায় । তখন আমরা খাদ্য কোথায় পাবো ? এই ত্রিশ কোটি মানুষ কি খেয়ে বাঁচবে ? সেজন্য আমাদের নিজস্ব কৃষি থাকা চাই যা আমাদের খাদ্যের নিরাপত্তা দেবে । আরও একটা কারণ হলো, সব লোক যদি কৃষি-আবাদ ছেড়ে শহরে বাস করে, তখন শহরের উপর চাপ বাড়বে । গ্রাম হয়ে পড়বে মানুষশুন্য । কৃষি আবাদের মাধ্যমে দেশের মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, সেটাই প্রত্যাশা ।

আনিছা কিছু বলল না । চুপ হয়ে গেল ।

জাহেদ বললো, এবার বলুন, এখানে কই থাকেন ?

- এইতো ব্যাংক থেকে পনের মিনিটের হাঁটা পথ । বড় বাজারের একেবারে মাথায় । প্রতিদিন ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়ে হেঁটে আসি তারপর ফিরে যাই সেই পথে । মাঝে মাঝে পথে দাঁড়াই । ভালো লাগে ব্রহ্মপুত্রের আলো হাওয়া । একবার আসুন না বাসায় ।

- যাবো, নিশ্চয় যাব । আপনি না বললেও যেতাম, এই বলে জাহেদ হেসে দিলো । বললো,

না এমনি বললাম । দেখলাম আপনি কেমন ঘাবড়িয়ে যান । বাংলাদেশের কৃষি আর ভূমিহীনদের নিয়ে কিছু পড়াশুনা করতে চাই । সেটা কিভাবে আগাবো ?

- এর খুব ভাল ব্যবস্থা আছে জাহেদ সাহেব । এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় । ওদের বিশাল লাইব্রেরি আছে । কৃষি আর ভূমিহীনদের নিয়ে প্রচুর কালেকশন । আপনি চাইলে সেখানে গিয়ে পড়তে পারেন । এ ব্যাপারে আমাদের অফিস আপনাকে সাপোর্ট দেবে ।

একটু থেমে আনিছা আবার বলতে শুরু করলো,

আমি তো ওখানে লেখাপড়া করেছি । ছিমছাম ক্যাম্পাস, একেবার ব্রহ্মপুত্র ঘেঁষে । আপনি কখনো গিয়েছেন ?

- হ্যাঁ গত সপ্তাহে । ওদের ক্যান্টিনে গরম ভাত দিয়ে পুঁটি মাছের ঝোল খেলাম । সেই সাথে আলুর চপ । কি সুন্দর মোলায়েম চপ বানিয়েছে ওরা ।

- একা গিয়েছিলেন ?

- একাই গিয়েছিলাম । রিকশায়ালাকে বলতে নিয়ে গেলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে । সারাদিন কাটালাম । এক ফ্যাকাল্টি থেকে আরেক ফ্যাকাল্টি । লাল ইট দিয়ে গাঁথা দালানগুলো । মাঝে মাঝে খোলা জায়গা । অনেক জায়গা নিয়ে বানিয়েছে ক্যাম্পাসটা । ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যে

- তাহলে তো আপনার ভাল ঘোরা হয়েছে, ময়মনসিংহ শহর দেখেননি ?

- দেখেছি । ময়মনসিংহ আসবার পরপরি শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম । ছেলে বয়সের এক রিকশাওয়ালা পাওয়া গেল । নাম সবুজ, ও আমাকে সারা শহর ঘুরিয়ে দেখাল ।

- ব্রীজ পার হয়ে ওপারে গিয়েছেন ?

- হ্যাঁ গিয়েছি । সবুজই তো আমাকে নিয়ে গেল ব্রীজের ওপারে । কি সুন্দর ধানের ক্ষেত, সারি সারি করে সাজানো । নদীর ওপারে সবুজের বাসা । ওর বাসায় গিয়ে সবার সাথে আলাপ হলো । মা আছেন, বাবা নেই । দুই বোন আছে, স্কুলে পড়ে ।

- তাহলে তো আপনার সাথী জুটে গেছে এরি মধ্যে ?

- বলতে পারেন, এই বলে জাহেদ হেসে দিলো । প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে দেখি সবুজ দাঁড়িয়ে আছে । তারপর থেকে ওর রিকশায় যাতায়াত করি ।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে । অফিসের সময় শেষ হয়ে এলো । একে একে সবাই বাড়ী ফিরছে । আনিছা বললো, চলুন বাড়ী ফেরা যাক । আপনার সাথে আবার বসবো । কাল পরশু আমি ট্যুরে যাব ময়মনসিংহের বাইরে । সামনের সপ্তাহে আসতে পারেন ?

- আসব । আপনার চা-মন্ডার জন্য ধন্যবাদ ।

।। নয় ।।

ঘরের মানুষ

সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি বাদলা শুরু হয়েছে । আনিছাদের বাড়ীর ছাদের একটা অংশ সিমেন্টে দিয়ে গাঁথা, বাকিটা টিন দিয়ে মোড়ানো । সেই টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনলো আনিছা । টিনের ছাদ বেয়ে পানি উঠোনে পড়ছে তারপর সেই পানি গড়িয়ে বড় বাজারের রাস্তায় । বাইরে ঝড়ো হাওয়ার জন্য ইচ্ছে করে সব বাতি নিভিয়ে দিয়েছে বিদ্যুতের লোকেরা । পাশের ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে অলি পড়ছে । সামনের সপ্তাহে ওর সেমি ফাইনাল ।

বাইরে অনবরত কড়া পড়ছে । কে এলো এত রাতে ? জানালা সরিয়ে আনিছা দেখলো সাকিব দাঁড়িয়ে আছে, ঝড়ো হাওয়ায় তার জামা উড়ছে যেমন পালের নৌকা পত পত করে উড়ে চলে ।
আনিছা গিয়ে দরজা খুলে দিলো ।
হন্তদন্ত হয়ে সাকিব ঢুকলো । বললো,
তোমরা ভালতো ? বাইরে খুব বজ্রপাত হচ্ছে । যে ঘরে টিনের ছাদ আছে, সেখানে না বসাই ভাল ।

আনিছা দেখলো বৃষ্টিতে ভিজে গেছে সাকিবের জামাকাপড় । মাথার পাশ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে । লম্বা লম্বা চুল পানিতে ভিজে ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে আছে । সাকিবকে খুব অপরিচিত মনে হলো আনিছার ।

সুরাইয়া বেগম এসে বললেন, এই ঝড়ের মধ্যে কোত্থেকে এলি ? একদম ভিজে গেছিস, এই বলে টাওয়াল দিয়ে সাকিবের মাথা মুছতে লাগলো ।
- খালা, তুমি অযথা ব্যস্ত হচ্ছ । আমার কিছুই হয় নি । আমি তোমাদের খোঁজে এসেছিলাম ।

- বেশ করেছিস । এই শুকনো জামা পড়ে নে তারপর আমার কাছে এসে বস । চুল তো বানিয়েছিস পাখির বাসা । এতো বড় চুল কেউ রাখে? টাওয়াল দিয়ে মুছতে মুছতে সুরাইয়া বেগম বললেন ।

- খালা, আমার আর এক মুহূর্ত থাকা সম্ভব হচ্ছে না । বাবা ওদিকে একলা । তোমাদের কিছু লাগলে জানাবে, এই বলে কাউকে কোন সুযোগ না দিয়ে সাকিব বেরিয়ে গেলো ।

ছেলেবেলায় একবার আনিছারা শম্ভুগঞ্জের মেলায় গিয়েছিল । তখন আনিছা স্কুল ম্যাট্রিকুলেশন দিয়েছে কেবল, রেজাল্ট বের হয়নি । সাকিব তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ইংরেজীতে অনার্স । তখন শম্ভুগন্জ যেতে নদী পার হতে হতো নৌকায় । তখনো ব্রীজ হয়নি । আনিছার সাথে ছিল সাকিব আর আনিছার এক বন্ধু । নদীর মাঝপথে আসতে কোত্থেকে একটা ঢেউ এসে নৌকাটা নাড়িয়ে দিল । আনিছা সামলাতে পারলো না, পড়ে গেল নদীতে । পানিতে পড়েই আনিছা ডুবতে শুরু করলো । ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে আনিছা । সাকিব আর দেরি করলো না, ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে তারপর হেঁচকা টানে তুলে আনলো আনিছাকে । নৌকার মাঝি বৈঠা ফেললো, সেই বৈঠা বেয়ে উপরে উঠে এলো ওরা ।

পানিতে ডুবে যাবার কথাটা প্রায়ই মনে পড়ে আনিছার । যখন বাইরে ঝুম ঝুম শব্দে বৃষ্টি নামে, তখন মনে হয় এই বুঝি তলিয়ে যাচ্ছে সে তারপর হেঁচকা টানে সাকিব তুলে আনে । লম্বা করে শ্বাস নেয় আনিছা ।

।। দশ ।।

ব্রহ্মপুত্রের কোলে

আনিছারা আজ ব্রহ্মপুত্র পাড় হয়ে শম্ভুগঞ্জে এসেছে । এখানে কোথাও জাহেদ সাহেবেরা ভূমিহীনদের জন্য বাড়ী বানাবেন । ভূমিহীনদের মোটামুটি একটা তালিকা তৈরি করলো ওরা । প্রথমে এক হাজার পরিবারের জন্য বাড়ী হবে । তিন রুমের কাঁচা-পাকা বাড়ী । সরকার প্রয়োজনীয় জমি সরবরাহ করতে রাজি হয়েছে । এ নিয়ে সরকারি টিম ঘুরে গেছে গত সপ্তাহে ।

দুপুরে খেতে এলো ওরা শম্ভুগঞ্জের প্রান্তে খুপড়ি এক হোটেলে । একেবার নদীর গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে হোটেলটা । নদীর কুলকুল শব্দ শুনলো ওরা । বড় বড় রুই, কাতল, মৃগেল রান্না হয়েছে বড় বড় ডেকচিতে । এতো ঘন শুরা পড়েছে যে মাছের টুকরোগুলো চোখে পড়ছে না । ঘন পেয়াজ, রসুন আর মসল্লার নিচে পড়ে আছে সেগুলো ।

জাহেদ বললো, এ যে দারুণ ব্যাপার, আমার জিভায় পানি চলে এসেছে ।
আনিছা হেসে বললো, তাহলে দেরি না করে ডেকচি থেকে তুলে নিন ।

জাহেদ সামান্য ভাত নিলো কিন্তু বড় বড় রুইয়ের টুকরো । প্লেট ভরে লাল শাক । বললো, সব চেয়ে ভাল কি জানেন ? ভাত কম নেবেন কিন্তু তরকারি বেশি করে । ভাত বেশি নিলেই বিপদ, কদিনে ফুলে-ফেপে বড় হয়ে উঠবেন ।
আনিছা হাসলো কিছু বললো না ।
জাহেদ বললো, আপনি নিলেন না ?
- নিচ্ছি । আনিছা খাবার তুলে নিল ।
জাহেদ বললো,
এটুকুন খাবেন ? আমি বলেছি ভাত কম খেতে, তরকারি বেশি করে । আপনি তো কোনটাই নেননি ।
- আমি এটুকুই খাই । আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না ।

- তাই, ভাল । আপনি কেন এত শুকনো, তা বুঝতে পারছি কিন্তু আপনার তো অনেক শক্তি থাকা চাই কারণ আপনাকে গ্রামে-গঞ্জে ট্যুরে যেতে হয় । না, না এটুকুন খেলে চলবে না, এই বলে জাহেদ মস্ত একটা মাছের টুকরো আনিছার পাতে তুলে দিল ।

আনিছা হেসে দিল ।

- আমি হাজার চেষ্টা করলেও খেতে পারবো না । বরন্চ আপনি চেষ্টা করুন, এই বলে মাছটা জাহেদের পাতে ফিরিয়ে দিল ।

জাহেদ হাসলো । কিছু বললো না ।

- রাগ করলেন জাহেদ সাহেব ?

- রাগ করবো কেন ? মোটেই রাগ করিনি । ছেলেরা রাগ করলে একদম মানায় না ।

আনিছা কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল আবারও ।

কিছুক্ষণ পরে আনিছা বললো, বাংলাদেশ কেমন লাগছে ?

- দারুণ । এত আদর যত্ন পাব ভাবিনি । সরকারি দপ্তর থেকে সাহায্য পাচ্ছি, পাশাপাশি আপনার সাহায্য তো আছেই । এবার আমেরিকা গিয়ে আপনার জন্য গিফট পাঠাবো ।

- গিফট লাগবে না । আপনি ভালয় ভালয় কাজটা শেষ করুন, তাতেই হবে ।

- একটা গিফট দিতে চাইলাম আর আপনি নিতে চাচ্ছেন না । এটা নিতে কি খুব অসুবিধে, মিস আনিছা ?

- না, তা কেন হবে । অযথা কষ্ট করবেন কেন ?

জাহেদ বললো,

আমরিকার সমাজে গিফট দেয়া-নেয়া খুব চলে । আপনজনকে সবাই গিফট দিতে পছন্দ করে ।

- ঠিক আছে, আনিছা মাথা নেড়ে বললো ।

- তবে বলুন আপনার কি পছন্দ ?

- জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি । সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো ।

জাহেদ হেসে বললো, এত কিছু থাকতে জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি । কোন কারণ আছে কি ?

- হ্যাঁ আছে ।

- জানতে পারি ?

- অবশ্যই পারেন । যখন স্কুলে পড়তাম, তখন জর্জ ওয়াশিংটনকে নিয়ে একটা গল্প পড়েছিলাম তারপর থেকে জর্জ ওয়াশিংটনকে ভাল লাগে । ওয়াশিংটনের ছবি, পোস্টার পেলে যত্ন করে রেখে দেই ।

- ঠিক আছে, তাই হবে । আপনাকে তো আগে বলেছি, আমেরিকান সমাজের মানুষেরা রাখ ঢাক করে কথা বলতে পছন্দ করে না, যা বলার বলে দেয় । আমি সেই সমাজের অনেক কিছু পেয়েছি তাই রাখ ঢাক করতে পারি না । আপনার সিমপ্লিসিটি আমার ভাল লাগে তবে আপনি বেশি সিম্পল ।

- কিভাবে বুঝলেন ?

- আপনার চাল-চলন, কথা-বার্তা বলে দেয় সে কথা । আপনার সাথে যে থাকবে, সে হেসে খেলে জীবন পার করে দেবে ।

- আপনি যা ভাবছেন আসল ব্যাপারটা উল্টোও তো হতে পারে ?

- না, উল্টো হবে না । আমি লিখে দিতে পারি । মিস আনিছা, আমেরিকায় যেতে চান ? আপনি চাইলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি ।

- আপনাকে ধন্যবাদ । এখানে আমি ভাল আছি । প্রতিদিন ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়ে অফিসে আসি, বিকেলে ফিরে যাই । আমার বাবা ছোট্ট একটা বাড়ী করেছেন বড় বাজারে । সেই বাড়ীতে আমরা বড় হয়েছি । সেই বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাব না আমি ।

জাহেদ হাসলো । কিছু বললো না ।

আনিছা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কবে নাগাদ আমেরিকা গিয়েছিলেন ?

- তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি মতিঝিল সরকারি স্কুলে । বাবা আমাদের নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দিলেন, সেই থেকে আমেরিকা । দেখতে দেখতে বিশটা বছর কেটে গেছে । বাবা তার ইন্জিনিয়ারিং ফার্ম অনেক বড় করেছে গত বিশ বছরে । কিছুদিন পর আমিও বাবার সাথে যোগ দেব কারণ বাবা একা পেরে উঠছেন না । বাবার ডিজাইনের হাত খুব ভাল । অনেক বড় বড় বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করেছে বাবা ।

- আসলে আপনি কোন দেশের মানুষ জাহেদ সাহেব ?

জাহেদ হেসে বললো,

বাংলাদেশ আমার জন্মভুমি তাই বাংলাদেশকে ভালবাসি । আমেরিকাকেও ভালবাসি কারণ সে দেশের আলো হাওয়ায় বড় হয়েছি । ইন্জিনিয়ার হবার শখ ছিল । ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে

ইন্জিনিয়ারিং পড়ি তারপর চাকরিতে । অনেক কিছু শিখেছি আমেরিকার কল্যাণে তাই এই দুই দেশের জন্য আমার দরদের ঘাটতি দেখবেন না, মিস আনিছা ।

- শেষমেষ কোথায় থাকবেন ঠিক করেছেন ?

- সেটা নির্ভর করছে কার সাথে সংসার শুরু করি । যদিও আমেরিকায় আছি এর মানে এই না বাংলাদেশে সেটল করতে পারবো না । বেশ মানিয়ে নিতে পারবো আমি ।

আনিছা কিছু বললো না । পানির গ্লাসটা তুলে নিল ।

দুজনেই চুপ হয়ে আছে । হোটেলের জানালা গলিয়ে নদীর শীতল হাওয়া ওদেরকে নাড়িয়ে ফিরছে । যতদুর দৃষ্টি যায়, শুধুই নদী । নদীর চরে মাঝিরা জাল বিছিয়েছে ।

জাহেদ বললো, আপনার বাসায় কে কে আছে ?

- আমি আর মা । ছোট একটা ভাই আছে, নাম অলি । এবার ম্যাট্রিক দেবে জিলা স্কুল থেকে । বাবাকে হারিয়েছি যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি ।

- তার মানে বিয়ে শাদি করেননি ?

- করেছিলাম । টেকেনি, শুরুতেই ভেঙে যায় ।

জাহেদ থমকে গেল । সে ভাবেনি এমন কিছু শুনবে ।

- সরি, আমাকে মাফ করবেন । আমি না জেনে কথাটা জিজ্ঞেস করেছি ।

আমানের কথা মনে হলো আনিছার । এতদিনে আমান নিশ্চয় বিয়ে করে ফেলেছে রুপাকে । আনিছার বিয়ে হলো দুদিনে আবার ভাঙলোও দুদিনে । আনিছা চলে এলো বড় বাজারের বাসায় । তখন সাকিব এসে পাশে বসলো । অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো সাকিব ওর পাশে ।

আনিছা বলল,

- জাহেদ সাহেব, আপনি দুঃখিত হোন অথবা না হোন, যা হবার তা তো হয়ে গেছে । এখন শুধু অপেক্ষার পালা ।

জাহেদ আর আনিছা আবারও চুপ । কেউ কোন কথা বলছে না । এই পিনপতন নিরবতা ভেঙে জাহেদ বললো, কই আপনি তো খাচ্ছেন না ?

আনিছা খেতে মন দিল ।

জাহেদ বলতে লাগলো,

মিস আনিছা । ছাত্র জীবনে গৌতম বুদ্ধের দর্শন পড়েছিলাম । তিনি বলেছিলেন, মানব জীবন মাত্রই দুঃখময় । এখন দেখছি সবারি জীবনে দুঃখ আছে । আমরা চাইলেও পালিয়ে যেতে পারছি না, তার চেয়ে চলুন, দুঃখটা মেনে নেই ।

জাহেদের কথাটা ভাল লাগলো আনিছার ।

আনিছা বললো, আমি মেনে নিয়েছি । আমরা চাইলেও সব পাব না । সব পাওয়াটা মনে হয় ঠিক না ।

- সে কথা কেন বলছেন ?

- সব পেলে তো পাবার আনন্দ থাকবে না । কিছু কিছু ঘাটতি থাকা ভাল । আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি । ঠিক কারা সুখি ?

জাহেদ চুপ হয়ে গেল । বললো,

জটিল প্রশ্ন তারপরেও উত্তর দিচ্ছি, জীবন নিয়ে যাদের কমপ্লেইন কম, তারাই সুখি ।

- আপনি কি সুখি ?

জাহেদ হেসে বললো,

আমি ততটুকু সুখি, যতটুকু আমার কমপ্লেইন কম । আপনি আমার চেয়ে সুখি কারণ আপনি কখনো অভাব বোধ করেন না । আপনার জীবনে সমস্যা এলে তা পাশ কাটানো আপনার জন্য সমস্যা হবে না ।

- তাই ?

- ঠিক তাই, জাহেদ বলে উঠলো ।

- আপনি ভাগ্য মানেন জাহেদ সাহেব ?

চুপ হয়ে গেল জাহেদ । বললো,

ভাগ্য একটা জটিল ব্যাপার । এর স্বরুপ, পরিধি আর কার্যকারিতা নিয়ে সুষ্পষ্ট কোন তথ্য মানুষের জানা নেই । যেহেতু ভাগ্য নিয়ে সুষ্পষ্ট কোন তথ্য জানা নেই, এ নিয়ে হাঁকডাঁক করার মানেই হয় না । ভাগ্যে কি আছে সেটা বিবেচনায় না এনে কিভাবে ভাগ্য পরিবর্তন করা যাবে, তা নিয়ে ভাবা উচিত ।

- তাহলে ভাগ্য নিয়ে আপনি কোন সিদ্ধান্তে যেতে রাজি নন ?

- যে ব্যাপারটা কখনই জানা যাবে না, যে ব্যাপারটা অসম্ভব রকমের ধোঁয়াটে, তা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ পেড়ে কি লাভ ?

আনিছা আর কথা বাড়ালো না । চুপ হয়ে গেল ।

জাহেদ বললো, অবসর কিভাবে কাটান ?

- অবসর খুব একটা পাই না জাহেদ সাহেব, নয়টা পাঁচটা অফিস করি । প্রতিদিন নদীর পাড় দিয়ে অফিসে আসি, বিকেলে ফিরে যাই । ছুটির দিনে অলির বাগানে নেমে পড়ি, শুরু হয় বাগান পরিচর্যা । রাত দশটা বাজতেই ঘুম । এই ছোট্ট শহরে আমরা বেশ আছি ।

জাহেদ হাসলো । আনিছার কথা ভাল লেগেছে ওর ।

শম্ভুগঞ্জের মেলা

ব্রহ্মপুত্রের ওপারে শম্ভুগন্জ । আজ দুদিন হলো কাপড়ের মেলা শুরু হয়েছে । বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা বড় বড় থান নিয়ে হাজির । হাওয়াই মিঠাই থেকে শুরু করে হাজারো রংয়ের কাপড় । থান কাপড়ের পাশাপাশি শাড়ির স্টল বসেছে । লাল পাড়ের শাড়ি দিয়ে শাড়ির দোকানগুলো ঠাসা । হাড়ি-পাতিলের দোকান বসেছে কয়েকটা । এধারে দুই একটা খাবারের দোকান । লোকজন বসে খাচ্ছে ।

ফাহিম গোলাপ ফুলের স্টল দিয়েছে । বড় বড় গোলাপ এনেছে ফাহিম । অলির কাছে ট্রেনিং নিয়ে আজকাল বড় বড় গোলাপ ফোটায় ফাহিম । অলির চেয়ে বয়সে বড় হলেও অলিকে সম্মান করে ফাহিম । অলি কাছে এলে উঠে দাঁড়ায় ।

বড় বড় রেক্সিনের পর্দা টানিয়ে মেলার প্যান্ডেল করা হয়েছে । ময়মনসিংহ শহরের অনেকেই মেলা দেখতে এসেছে । আনিছার যাবার কথা ছিল হঠাৎ আটকে গেছে কাজে ।

সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখছে অলি । ওর সবচেয়ে ভাল লেগেছে ফাহিমের স্টলটা । কি সুন্দর গোলাপ ফুটিয়েছে ফাহিম । বার বার অলিকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো । অলি হাঁটতে হাঁটতে কাপড়ের স্টলে এলো । সবাই হুমড়ি খেয়ে কি যেন দেখছে । এত ভিড় ভাট্রায় যেতে মন চাইলো না । বেরিয়ে এলো অলি ।

- এই যে অলি ভাই, কখন এলে ?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো খুকু দাঁড়িয়ে আছে । তার দিকে তাকিয়ে হাসছে ।

খুককে দেখে মনটা ভরে এলো অলির । বললো,

অনেকক্ষণ হলো এসেছি । বাড়ী ফিরবো এখন । আমার সাথে যাবি ?

- ঠিক আছে চলো । দাড়াও চিরুনিটা নিয়ে আসি, এই বলে খুকু দৌড়ে গেল তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো ।

- এবার চলো ।

- ব্রীজ দিয়ে ফিরবি না নৌকা করে ?

- নৌকায় ।

- এক কাজ করলে কেমন হয় ?

- কি ?

- নৌকা ভাড়া করে কিছুক্ষণ ঘুরি তারপর সন্ধ্যের আগে আগে ফিরে যাব ঘাটে । কি বলিস ?

আনমোনে খুকু মাথা নাড়লো ।

নৌকার ঘাটে পৌছতে পৌছতে বেলা গড়িয়ে গেল । বিকেল শুরু হয়েছে ব্রহ্মপুত্রে । সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে নদীর ঘাটলায় । মাঝারি সাইজের নৌকা পাওয়া গেল । বুড়ো মতন মাঝি, কাঁচা পাকা দাড়িতে ভরে আছে চোয়ালের নিচটা । অলিদের দেখে বললো, উঠে পড়েন । বেল থাকতে ঘাটে পৌছে দেবো ।

নৌকা ভাসিয়ে দিলো বুড়ো মাঝি । সোজা উত্তরমুখী । ঘন্টা খানেক ঘুরিয়ে অলিদের ঘাটে পৌছে দেবে ।

- ঢাকা থেকে কবে ফিরলে ? খুকু জানতে চাইল ।

- সকালের ট্রেনে ফিরেছি ।

- সাকিব ভাই গিয়েছিল ?

- হ্যাঁ ।

- কি দেখলে ?

- ফুলের মেলা । ঢাকার ফুলগুলো আসলেই বড় বড় । ওমন একটা বড় গোলাপ ফোটাতে পারলে খুব শান্তি পেতাম ।

- তোমাদের ফুকুসিমা কি বলে ?

- সে যা বলার বলেছে তারপরেও হচ্ছে না । কোথায় যেন আমরা ভুল করছি ।

- তোমাদের গোলাপ তো কম বড় না অলি ভাই ?

- তা ঠিক কিন্তু ঢাকার মতন না ।

- তাহলে এখন কি করবে ?

- ঢাকা গিয়ে নূতন পদ্ধতি শিখে এসেছি । সেভাবে চেষ্টা করবো ।

- সাকিব ভাই কি বলে ?

- নিউমার্কেট থেকে সাকিব ভাই নূতন বই এনেছে । ওটা পড়ে বলবে আর কি কি করা যেতে পারে ।

- আমার মনে হয় মাটি বদলাতে হবে । এখানকার মাটি দিয়ে ওত বড় গোলাপ ফুটবে না ।

- শুধু মাটি না । আবহাওয়া আরেকটা কারণ ।

খুকু এইবার হেসে বললো, তুমি পারবে । শেষমেষ তুমি ঠিক ঠিক পারবে মস্ত বড় গোলাপ ফোটাতে ।

- কি ভাবে বুঝলি ?

- বোঝা যায় । তোমারা যে শ্রম দিচ্ছ, তাতে গোলাপ না ফুটে উপায় কি ? যাই হোক, flying ghost কেমন দেখলে ?

- দারুণ সিনেমা । খুব ভাল লেগেছে । মা তো ভয়ে অস্থির ।

- কেন?

অলি বলতে লাগলো,

মা একটুতেই ভয় পায় । ভয় রোগটা তার ছেলেবেলা থেকে । রাতের বেলা লাইট জ্বালিয়ে ঘুমাবে । হাতের কাছে সব সময় টর্চ রাখবে যেন কারেন্ট চলে গেলে বাতি জ্বালাতে পারে । ঝড়ের রাতে মা ঘুমাতে পারে না । আমাদের জড়িয়ে বসে থাকে । আমরা হাসতে হাসতে মরে যাই ।

- আপনার বুঝি খুব সাহস অলি ভাই ?

- তা না তবে মার চেয়ে আমি অনেক সাহসী ।

- সাকিব ভাই ?

- সাকিব ভাই ...... বলতে পারছি না তবে আমাদের বাসায় সবচেয়ে সাহসী আনিছা আপু । আনিছা আপুকে কখনো ঘাবড়াতে দেখিনি । আমি খুব ভালবাসি আপুকে ।

- কে না ভালবাসে আনিছা আপুকে ? খুকু হেসে বললো ।

- সবাই । শুধু আমান ভাই বুঝলো না । আপাকে ছেড়ে চলে গেল ।

- আপু খুব কষ্ট পেয়েছে, তাই না ?

- আপু তো কষ্ট পেলেও বলবে না । সারাদিন হেসে খেলে পার করে দেবে ।

- আমান ভাই আর আসবে না ?

- না । শুনেছি উনি বিয়ে করে ফেলেছেন ।

খুকু চুপ হয়ে গেল । আনিছা আপুর জন্য কষ্ট হতে লাগলো । দেখতে দেখতে ওরা অনেক দূর চলে এসেছে । বিকেলের শেষ আলো মিলিয়ে লালটে রঙ নেমেছে আকাশে । একটু পরেই রাত নামবে । নক্ষত্রে নক্ষত্রে ছেয়ে যাবে সারাটা আকাশ ।

অলি বললো, মাঝি চাচা, ফিরে চলেন । রাত হলো ।

নৌকা ঘুরে গেল, সোজা ঘাট বরাবর । বিকেল থেকে নদী একদম শান্ত । সারা বেলা দৌড়ঝাপ পেড়ে ব্রহ্মপুত্র বিশ্রামে চলে যাচ্ছে । সারারাত গুম হয়ে বসে থাকবে তারপর ভোর না হতেই ঢাকঢোল নিয়ে নামবে আবার ।

- সারোয়ার আপা কি আবারও বকেছে ? অলি জানতে চাইলো ।

- না, আর বকেন নি । আসলে আপা খুব ভাল । আমাদের যত্ন করে পড়ায় । মাঝে-মধ্যে হুটহাট রেগে যান । আপার হাসবেন্ড আপাকে ছেড়ে চলে গেছে তাই আপার মেজাজ ঠিক নেই ।

- তোরও তো একদিন হাসবেন্ড হবে ?

খুকু লজ্জা পেয়ে গেল । সারা মুখ লাল হয়ে এলো ওর ।

খুকু কথা ঘুরিয়ে বললো, তোমার সেই স্টেশনের লোকটা কই ? তুমি না থাকলে লোকটা জ্বরে মরে যেত ।

- উনি ভাল আছেন । উনার ছেলে এসেছিল গত সপ্তাহে । এক গাদা আম, কাঠাল আর আচার দিয়ে গেছে ।

আচারের কথা শুনে খুকুর খুব খেতে ইচ্ছে হলো । বললো না সে কথা ।

- আচারটা খুব মজার । তোর জন্য আনিছা আপু রেখে দিয়েছে । কাল পরশু আসিস ।

খুশি হয়ে উঠল খুকু ।

- তোমাকে একটা কথা বলতে চাই অলি ভাই ।

- বল ।

- বলো, সত্যি জবাব দেবে ?

- দেবো, অলি মাথা নেড়ে বললো ।

- আমার ডান হাতের সাদা চামড়া নিয়ে তুমি খুব কষ্ট পাও, তাই না ?

অলি অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইলো ।

- হ্যাঁ কষ্ট পাই । মনে হলেই মনটা খারাপ হয়ে যায় ।

- আই এম সরি অলি ভাই । আমার জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে হয়, এই বলে খুকু কেঁদে দিল ।

অলির মুখ ম্লান হয়ে এলো । বললো, কাঁদিস না । তুই কাঁদলে আমার আরো কষ্ট হয় ।

খুকু চুপ হয়ে গেল । তাকিয়ে দেখলো এক ঝাক সাদা হাস বাড়ী ফিরছে । কী সুন্দর সাদা পালকে ঢাকা ওদের নরম শরীর । কোথাও কোন দাগ নেই ।

দেখতে দেখতে ঘাট চোখে পড়লো । ডানে বাঁক নিলেই ঘাট । নদীর ঘাটলায় আলো জ্বলতে শুরু করেছে ।

হালুয়া ঘাট

হালুয়া ঘাটে পৌছতে পৌছতে বেলা হয়ে গেল । ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শম্ভুগঞ্জের উপর দিয়ে হালুয়া ঘাটে যেতে হয় । দু-ধারে ধান ক্ষেত, তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা । মাথার উপরে তখন কড়কড়ে রৌদ্রু । শুষ্ক বাতাস বইছে চারিপাশে । বাতাসের তালে তালে শুকনো পাতাগুলো উড়ে ফিরছে । এই হালুয়া ঘাটে এক কবিরাজের সন্ধান পাওয়া গেছে । দূর-দূরান্তের লোকেরা আসে চিকিৎসার জন্য । খুকুর জন্য একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে অলি ।

অলিরা কলপাড়ে এলো । মস্ত বড় বটের নিচে এই কলপাড় । টিউবওয়েল চেপে পানি খেলো ওরা । গাছের ছায়ায় মিষ্টি পানিতে ওদের মন ভরে এলো । আগের সেই গরম ভাবটা নেই । দূরের ক্ষেতখোলা থেকে হালকা বাতাস ভেসে আসছে ।

অলি বললো, চল, আমরা খেয়ে নেই ।
খুকু মাথা নেড়ে সায় দিল ।

ক্ষুধা পেয়েছে অলিদের । খুকুকে নিয়ে একটা হোটেলে ঢুকলো । ছোট্ট হোটেল, বাঁশের ছাপরা দেয়া । চারিদিকে টিনের বেড়া, বড় একটা বটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে । হালুয়া ঘাটের লোকজন ডাল-ভাত খাচ্ছে ।
অলি বললো, কি খেতে চাস ?
-তুমি যা খাবে ।
- ঠিক আছে । খাবার নিয়ে আসি ।
অলি চলে গেল খাবার আনতে ।

অলি গিয়ে দেখলো মস্ত বড় মাছ রান্না হয়েছে । মাছের চারিপাশে ঘন টমেটোর ঝোল । পাশেই সাদা ভাত নেমেছে । সাদা ভাতের আঘটে গন্ধে ভরে উঠেছে ওধারটা ।

দুই প্লেট ভাত নিলো অলি, সেই সাথে মাছের টুকরো । তিন-চারটে লাউয়ের আঁশ তুলে নিল ওপাশ থেকে ।

খাওয়া সেরে ওরা বেরুলো কবিরাজের খোঁজে । এখান থেকে এক কিলোমিটার হবে করিরাজের বাড়ী, গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে যেতে হয় ।

রিকশায় উঠে পড়লো ওরা । ক্ষেত খোলা মাড়িয়ে রিকশা এগুচ্ছে ।

অলি বললো, হাসান কবিরাজকে চেনেন ?
রিকশায়ালা হেসে দিলো ।
- হাসান হুজুরকে চেনেনা এ রকম মানুষ এলাকায় পাবেন না । উনি নামকরা কবিরাজ । সবাই তাকে পীরও মানে, চিকিৎসা দেয় পাকাপোক্ত ।
- উনি পীর নাকি ?
- হো । উনার অনেক মুরিদ আছে । রাত-বিরাইতে গজলের আসর বসে । মাঝে-সাঝে গিয়া বসি । কত রকমের মারফতি গান গায় । হুজুর কলেজ পাশ । বিএ পড়তে কলেজে ভর্তি হয়েছিল । শেষমেষ পড়েন নাই । এখন কবিরাজি করে ।
- বয়স কতো হুজুরের ?
- পন্চাশ-পন্চান্ন তো হবে । অনেকে বলে হুজুরের বয়স ষাট কিন্তু কেউ হুজুররে বয়স জিগাইতে সাহস পায় না ।
- হুজুর কি ধরনের চিকিৎসা করেন ?
- যখন হাসপাতলের ডাক্তাররা ফেল মেরে যায়, তখন হুজুরের কাছে আসে লোকজন ।
অলি খুশি হয়ে গেল । তাকিয়ে দেখলো খুকুও খুশি হয়েছে ।
- হুজুরের পরিবার কি এখানেই থাকে ?
- হাসান হুজুর তো বিয়ে করেন নাই । একলা থাকেন । মাঝে মধ্যে কই যেন উধাও হয় আবার ফিরে আসে সপ্তাহ খানেক পরে । কৈ গেছিলো, কেন গেছিলো কেউ বলতে পারে না । হুজুর কিছু এতিম পোলাপান পালে । ওরাই ঘরবাড়ী ঝাড়ু দিয়া রাখে ।
- আপনার সাথে হুজুরের পরিচয় আছে ?

রিকশায়ালা আবারও হেসে দিলো ।

- পরিচয় লাগবো না । যে কেউ হুজুরের সাথে দেখা করতে পারে । হুজুর সবাইরে আপনে কয় । দেখবেন আপনারেও কেমন আপনে আপনে করতেছে । রিকশায়ালা একটু থেমে বললো,, হুজুরের কাছে কি মনে করে আসলেন ?

- চিকিৎসা করাবো, এই বলে খুকুকে দেখিয়ে দিলো অলি ।

- ঠিক জায়গাতেই আইছেন । আপনাদের আশা পূরণ হইবো, এই বলে রিকশায়ালা থেমে গেল ।

- ঐ যে দেখেন পুকুরপাড়, ঐ পাড়ের সাথে হাসান হুজুরের ঘর ।

পুকুরপাড়ের সামনে চলে এলো ওরা । দরজায় টোকা দিতে একটা ছেলে বেরিয়ে এলো । দশ বারো বয়স হবে ।

অলিকে দেখে বললো, কাকে চান ?

- হুজুরের সাথে দেখা করতে এসেছি আমরা ।

- ঠিক আছে পাশের ঘরে বসেন । আমি হুজুররে খবর দেই ।

ওরা গিয়ে বসলো ছাপরা দেয়া ঘরে । বাঁশ বেত দিয়ে বানানো । কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব ।

দেখতে দেখতে একটা লোক ঘরে ঢুকলো । হালকা পাতলা মানুষ । উচ্চতা প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি । সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়েছে । মুখ সুন্দর করে কামানো । বয়স পন্চাশের মতন হবে । বয়সের তুলনায় মুখে ভাজ পরেনি ।

- আপনারা শহর থেকে আসছেন ?

- জ্বি, অলি বললো । আমরা হুজুরের সাথে দেখা করতে চাই ।

লোকটা হেসে বললো,

আমার নাম হাসান । লোকে আমাকে হাসান হুজুর বলে ।

অলি আর খুকু নড়ে বসলো । এই লোক যে হাসান হুজুর, মেলাতে পারলো না ওরা । হুজুরদের সম্পর্কে অলিদের ধারণা ছিলো, লম্বা দাড়িওয়ালা আলখেল্লা পড়া মানুষ ।

- আপনাদের পরিচয় জানতে পারি ?

- আমার নাম অলি । ম্যাট্রিক দেবো জিলা স্কুল থেকে । ওর নাম খুকু । বিদ্যাময়ী স্কুলে পড়ে ।

হাসান হুজুর বললেন, বলুন । আপনাদের জন্য কি করতে পারি ?

- আমরা এসেছি চিকিৎসার জন্য, এই বলে খুকুকে দেখিয়ে দিল অলি ।

- কি অসুখ ?

- হাত বাড়িয়ে দিলো খুকু ।

হাতটা কাছে টেনে নিলো হাসান হুজুর । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো ।

- কত বছর হলো হয়েছে ?

খুকু বললো, তিন বছর ।

- রাতে জ্বর আসে ?

- না ।

- হাত ব্যথা করে ?

- না ।

- হাতের চামড়া দিয়ে কোন রস গড়িয়ে পড়ে ?

- না ।

হাসান হুজুর চুপ হয়ে গেলেন । অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন হুজুর । এভাবে দশ মিনিট কেটে গেল ।

আস্তে আস্তে অলি বললো, এখন আমরা কি করবো ?

- অলি সাহেব, এই রোগের চিকিৎসা আমার জানা নেই । আমাকে মাফ করবেন । এতদুর থেকে এলেন অথচ কিছু করতে পারলাম না ।

- সত্যি নেই ?

- না । সকল রোগের চিকিৎসা মানুষের জানা নেই ।

- এখন কি হবে হুজুর ? আমরা অনেক আশা নিয়ে এসেছি ।

হুজুর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,

সত্যি কথা কি জানেন, আমরা মানুষেরা খুব কম জানি । আমাদের হাতে সামান্যই ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন । তা দিয়ে খুব একটা এগুনো যায় না ।

অলি আর খুকু কথা বাড়ালো না । চুপ হয়ে গেলো ওরা ।

ধীরে ধীরে অলি বললো, খুকুর জন্য আপনি দোয়া করবেন ।

হাসান হুজুর হেসে দিল । কিছু বললো না ।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে । মাঝে মাঝে হাসান হুজুরের কথা মনে পড়ে অলির । কি সুন্দর লম্বা-শুকনা একটা লোকটা, হেসে হেসে কথা বলে । হুজুরের দিকে তাকালে বোঝা যায়, কি যেন ভাবছে দিনভর । লোকটা আসলে কি ভাবে ? সময় পেলে একবার জিজ্ঞেস করবে অলি । এর কিছু দিন পর অলি গেল হাসান হুজুরের বাসায় ।

অলি জিজ্ঞেস করলো, খুদাকে কোথায় পাওয়া যাবে হুজুর ?

- সে তো আপনার পাশে বসে আছে । ভাল করে তাকান দেখতে পাবেন ।

- কৈ দেখছি না তো ?

- ভাল করে তাকান ।

- ভাল করে তাকিয়েছি ।

- ভাল করে তাকাননি তাই দেখছেন না । বিশ্বাসের সাথে তাকান, ঠিক ঠিক দেখতে পাবেন ।

- ঠিক কতটুকু বিশ্বাসের সাথে তাকাতে হবে ?

- প্রতিদিন সূর্য উঠবে, এই যে বিশ্বাস আপনার আছে, সেই বিশ্বাসের সাথে তাকাতে হবে । খুদা তো ধরা দিতে চান, আমাদের অনিহা দেখে আগান না ।

অলির মন উশখুশ করছিলো একটা কথা জিজ্ঞেস করতে । হাসান হুজুর বুঝতে পারলো ।

- আপনি চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন । কোন অসুবিধা দেখছি না ।

- আপনি কি খুদাকে দেখেছেন ?

হাসান হুজুর হেসে দিল ।

- অনেকে আমাকে এই প্রশ্ন করে । এর উত্তর হলো, আমি কখনো খুদাকে দেখিনি কারণ সেই পরিমাণ বিশ্বাস আমার নেই । যদি কখনো হয়, তখন দেখতে পাবো । আপনার যতটুকু বিশ্বাস, ততটুকু আপনি দেখবেন ।

- সবাই যে আপনাকে পীর বলে ?

- আমি পীর নই তবে মারফতি গান বাঁধি । সেজন্য সবাই আমাকে পীর বলে । আমার কোন মুরিদ নেই তবে অনেকে আমার মুরিদ বলে পরিচয় দেয় ।

অলি একটু থেমে জানতে চাইলো, তাহলে পীর-মুর্শিদ কারা হুজুর ?

- পীর-মুর্শিদেরা অভাবশুন্য । না কারো কাছে তিনি হাত পাতলেন না কারো অপেক্ষায় রইলেন । তিনি একাই একশো । খুদা ছাড়া তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ।

- তাহলে খুদাকে পাবার পথ কি ?

হাসান হুজুর হেসে বললো, আপনি কি খুদাকে পেতে চান, অলি সাহেব ?

- না তা ঠিক না । জানতে ইচ্ছে করে ।

- দুনিয়াদারি কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলুন । নানা ধরনের ব্যবসাপাতি, চাকরি, ঘর-সংসারে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন । শর্ত হলো কখনো হারাম টাকা আয় করবেন না । এটাই আপনার পরীক্ষা । দুনিয়াদারির মধ্যে সৎ থাকা সবচেয়ে বড় বিশ্বাসের পরীক্ষা । যদি পরীক্ষায় পাস করেন, দেখবেন খুদা আপনার দোড়গোড়ায় । খুদাকে খুঁজতে কোথাও যেতে হবে না ।

- তাহলে যে আপনি বিয়ে শাদি করেননি ?

- এটা আমার দূর্বলতা । আমি সংসারকে ভয় পাই তাই বিয়ে শাদি করিনি । সত্যি কথা কি জানেন, খুদাকে খুঁজতে কোথাও যাবার দরকার নেই । ভাল করে কান পাতুন । দেখবেন কেমন আপনার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ।

এ কথা শুনে অলির শিহরন খেলে গেলো শিড়দাঁড়া বেয়ে । খুদা বুঝি সত্যি সত্যি ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ।

অলি বললো, এর মানে খুদাকে কোথাও খুঁজতে যাওয়া বোকামি হবে ?

- ঠিক তাই । এই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মন্ডের যা কিছু চোখে পড়বে সবই খুদার আরেক রুপ । তিনি হাজারো রুপে হাজারো অস্তিত্বে উপস্থিত । আমাদের চোখ নেই বলে দেখি না ।

একটু থেমে অলি বললো, খুদা কি আমাদের বন্ধু না প্রভু ?

- আপনার কি মনে হয় ?

- বলতে পারছি না ।

হাসান হুজুর বললো,

যারা খুদার প্রেমিক, তারা খুদাকে প্রভু বলতে নারাজ । তিনি প্রেমিক, একমাত্র প্রেমের মাধ্যমে তাকে পাওয়া যাবে । অন্যদল আবার খুদাকে প্রেমিক বলতে আপত্তি করবে । খুদা প্রেমের উর্দ্ধে ।

তিনি প্রভু, পরম-পরাক্রমশালী । সব কিছু তার পদানত । অলি সাহেব, আপনি যেভাবে খুদাকে দেখেন, তিনি তাই ।

- আপনি কোন দলে ?

- আমি কোন দলে ?

- হ্যাঁ, হুজুর ।

- আমি এমন একটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি, যখন খুদা ছাড়া আর কিছুই নজরে আসবে না । এমন একটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি, যখন আমি খুদাতে অথবা খুদা আমাতে অবস্থান করবে তারপর আমি আমার আমিত্বকে হারিয়ে খুদার সত্বায় লীন হবো ।

- কোন মানুষটা খাঁটি ? অলি জানতে চাইলো ।

- সেই মানুষটা খাঁটি যিনি সর্বত নিজের দোষ দেখতে থাকেন ।

- আপনি কি খাঁটি ?

- আমি খাঁটি নই । খাঁটি হলে খুদার বন্ধুর তালিকায় আমার নাম লেখা হতো । এই যে তিন যুগ ধরে খুদাকে ডাকছি, কৈ কখনো তো একটা শ্বাসের শব্দও শুনিনি ।

- আপনাকে নিয়ে কিন্তু বাইরে অনেক গল্প চালু আছে ?

- হয়তোবা । আমি কিছু কিছু শুনেছি । ওই গল্পের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । আমি একজন কবিরাজ, গাছ-গাছালি দিয়ে মূল্যবান ঔষধ বানাই । সে ঔষধে অনেকে আরোগ্য লাভ করে । তারা ভাবে এটা আলৌকিকতা । আসলে আমি আপনাদের মতন মানুষ ।

।। তের ।।

দেশে ফেরা

বিকেল হয়ে আসছে ধীরে ধীরে । লাইট ফ্যান বন্ধ করে অফিস থেকে বেরুলো আনিছা । কাল পরশু দুদিন ছুটি । এ দুদিন ঘরবাড়ী পরিষ্কারের একটা প্ল্যান করে ফেললো আনিছা ।

অফিস থেকে রাস্তায় নামতেই শুরু হলো মূষলধারে বৃষ্টি । দৌড়ে একটা টিনের ঘরে ঢুকলো আনিছা । অনেকেই উঠে এসেছে এই ঘরে । সামনে রাস্তা, পেছনে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র । রাস্তা দিয়ে রিকশা, টেম্পু এগুচ্ছে । একটা রিকশা এসে দাঁড়ালো । আনিছা বললো, ভাই যাবেন ?

- কৈ যাবেন ?

- বড় বাজার ।

- উঠেন ।

ঝড় জল নিয়ে আনিছা উঠে পড়ল রিকশায় । অনেক খানি ভিজেছে সে । রিকশায় উঠতে আরো একটু ভিজলো ।

দশ মিনিটের মাথায় আনিছা বাড়ী পৌছলো । বাসায় ঢুকতেই সুরাইয়া বেগম বললেন, জাহেদ এসেছে, তোর জন্য অপেক্ষা করছে বসার ঘরে ।

- আমি যাচ্ছি ।

কাপড় পাল্টে বসার ঘরে এলো আনিছা । জাহেদ উঠে দাঁড়াল ।

- হঠাং করে চলে এলাম । জানি আপনাকে বিপদে ফেললাম ।

- তা কেন হবে ? কাল পরশু তো আমাদের ছুটি, চা খাবেন জাহেদ সাহেব ?

- দিতে পারেন ।

- একটু বসুন, এই বলে আনিছা ঘরে চলে গেল ।

দশ মিনিট পর ফিরে এলো । চায়ের কাপে ধুঁয়া উড়ছে । তারপর বলুন, কেমন আছেন ? আপনার প্রজেক্ট তো প্রায় শেষ হয়ে এলো ।

- বলতে পারেন । দুই সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত করে ফেলবো তারপর ফিরে যাব আমেরিকাতে ।

- এর পরে আবার কবে আসছেন ?

- আর আসা হবে না । এর পরে দুজন আমেরিকান ভদ্রলোক আসবেন । ওনারা এসে কাজ শুরু করবেন ।

- তাই, বলে আনিছা চুপ হয়ে গেল ।

জাহেদ বলতে শুরু করলো,

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল । ও হ্যাঁ, জর্জ ওয়াশিংটনের ছবিটা পাঠিয়ে দেব । কি ধরনের সাইজ প্রেফার করেন ?

- আপনি যা ভাল মনে করেন । আমার কোন চয়েস নেই ।

- আপনি বেশি সিম্পল মিস আনিছা তবে আপনার সিমপ্লিসিটি আমার ভাল লাগে । আসুন না একবার আমাদের ওদিকে ।

- দেখি । সরকার থেকে মাঝে মধ্যে ট্রেনিংয়ে পাঠায় । সে রকম সুযোগ হলে আপনার সাথে দেখা করবো ।

- তাহলে আমার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার রাখুন, এই বলে ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিল জাহেদ । আমি কাল ঢাকা যাচ্ছি । ঢাকাতে দু সপ্তাহ থেকে আমেরিকা চলে যাব ।

- আপনার যাবার ডেটটা কবে ?

- এ মাসের পনের তারিখে প্লেনে উঠবো । সকাল ১১ টায় প্লেন ছেড়ে যাবে । টিকেট কনফার্ম করা আছে ।

- আপনার বাবা-মাকে ছালাম দেবেন আবার ময়মনসিংহ এলে আমাদের বাসায় দাওয়াত রইলো ।

জাহেদ হেসে বললো,

আর বোধ হয় আসা হবে না মিস আনিছা তবে আপনার সিমপ্লিসিটির কথা মনে থাকবে । আপনাকে চিঠি লিখলে জবাব পাবো ?

- হ্যাঁ, পাবেন ।

- আপনাকে কিছু বলার ছিল ।

- বেশতো বলুন, আনিছা মাথা নিচু করে বললো ।

জাহেদ থেমে গিয়ে বললো, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি ?

- নিশ্চয় পারেন ।

- পনের তারিখে আসতে পারবেন আমাকে প্লেনে তুলে দিতে ?

আনিছা ভাবেনি জাহেদ তাকে এরকম কিছু বলবে । তারপর হেসে বললো, ঢাকা এয়ারপোর্টে আসতে বলছেন ?

- হ্যাঁ, বলছি ।

- আমার যেতে আপত্তি নেই কিন্তু জানতে পারি কেন যেতে বলছেন ?

- ঐ যে বললাম আপনাকে কিছু বলার ছিল ।

আনিছা চুপ হয়ে গেল ।

- আপনাকে আরো এক কাপ চা দেই ?

- বেশ তো দিতে পারেন ।

আনিছা উঠে গেল । ফিরে এলো গরম চা নিয়ে ।

- আপনার চা খুব ভাল হয়েছে মিস আনিছা । আশা করছি বার বার খাবো, এই বলে জাহেদ হেসে দিলো তারপর বললো, আসছেন তো এয়ারপোর্টে ? ময়মনসিংহ থেকে শেষ রাতে একটা ট্রেন ছেড়ে যায় । ভোরে গিয়ে ঢাকা পৌঁছে তারপর এয়ারপোর্টে আমরা ব্রেকফাস্ট সারলাম । সেদিন আপনি আমার মেহমান । আমি প্লেনে উঠে গেলে আপনি ফিরতি ট্রেনে চলে এলেন, কি বলেন ?

আনিছা চুপ হয়ে গেল । অনেকক্ষণ পরে বললো, আপনাকে কথা দিচ্ছি না । যাবার চেষ্টা করবো আর যদি না যেতে পারি আমাকে ক্ষমা করবেন ।

- ক্ষমা চাইছেন কেন মিস আনিছা ? আপনার ইচ্ছে হলেই কেবল আসবেন । এবার আমি উঠি । আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সব কিছুর জন্য । আপনি ভাল থাকুন ।

- ডিনার করে যান আমাদের সাথে ? আনিছা অনুরোধ করলো ।

- ধন্যবাদ । আজ আর বসি না । খোদা হাফেজ ।

খুব বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে আনিছার । বাবার কথা মনে পড়লো ওর । আনিছার যে কোন সমস্যায় বাবাকে পাশে পেয়েছে সে । বাবার সাথে খোলামেলা আলাপ করতো আনিছা । হাসেম সাহেব খুব মন দিয়ে মেয়ের কথা শুনতেন তারপর একটা সিদ্ধান্ত দিতেন অথবা দুজনে বসে গবেষণা করতো কিভাবে সমাধান করা যায় ।

আজ অফিসে এসে কাজে মন দিতে পারছে না আনিছা । জাহেদ সাহেবের কথাগুলো বার বার মনে পড়ছে । অফিসের জানালা গলিয়ে ব্রক্ষপুত্র চোখে পড়লো আনিছার । কি সুন্দর তালে তালে ঢেউ আছড়ে পড়ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে নদীতে । মানুষের জীবন নদীর মতন, চড়াই-উৎরাই মাড়িয়ে নিরন্তর এগিয়ে চলে ।

আনিছা তখন ক্লাস নাইনে পড়ে বিদ্যাময়ী স্কুলে । পাড়ার একটা ছেলে আনিছাকে দেখলেই শিস দেয় । আনিছা কিছু বলে না । একদিন ছেলেটা একেবারে সামনে চলে এলো । হালকা-পাতলা ছেলে, গলায় লম্বা চেইন । ছেলেটা বললো, কই যাচ্ছেন আনিছা ?

- সকুলে ।
- একটু কথা ছিল ।
- বলেন ।
- এখানে না । নদীর ঘাটলায় আসতে পারেন ?

আনিছা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,

আমাকে ক্ষমা করবেন । আমি পারছি না ।

ছেলেটা আর কিছু বললো না । পথ থেকে সরে দাঁড়ালো । আনিছা হেঁটে স্কুলের দিকে গেল ।

বিকেলে হাসেম সাহেব অফিস থেকে এলে আনিছা তার বাবাকে টেনে নিয়ে গেল ।

- এই শোন একটা কথা আছে ।
- কি কথা ? হাসেম সাহেব ফিস ফিস করে জানতে চাইলেন ।
- এখানে বস, এই বলে হাসেম সাহেবকে বসিয়ে দিলো বাড়ীর বারান্দায় । নিজে একটা টুল নিয়ে এলো ।
- চা খাবে ?

- ঠিক আছে, খাই ।

আনিছা দৌড়ে চা নিয়ে এলো ।

চা খেতে খেতে হাসেম সাহেব বললেন, এবার বলো ।

সকালের ঘটনা খুলে বললো আনিছা ।

হাসেম সাহেব অনেক হাসলেন । বললেন,

ঘাবড়াসনে মা । এরকম সমস্যা অনেক আসবে জীবনে । শুধু মনে রাখবে, তুমি যেন কোন অন্যায় না করে ফেল ।

- ঐ ছেলেটা যদি আবার রাস্তায় ধরে ?

- ওকে বুঝিয়ে বলবে । দেখবে ও বুঝতে পারবে ।

- ঠিক বলছো তো বাবা ?

হাসেম সাহেব মাথা নাড়লেন ।

পরদিন স্কুলের পথে আবার ছেলেটা এসে দাঁড়ালো ।

আনিছা বললো, চলুন নদীর ঘাটে যাই ।

ছেলেটা খুশি হয়ে আনিছার পিছু পিছু এলো ।

আনিছা বললো, আইসক্রিম খাবেন ?

ছেলেটা মাথা নাড়লো ।

আনিছা দুইটা আইসক্রিম কিনলো একটা নিজের জন্য, অন্যটা ছেলেটার ।

ছেলেটা খুশি হলো খুব । বার বার আনিছাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো ।

- আপনি কি করেন ?

- কিছুদিন হলো কলেজ পাশ করেছি । এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়বো ।

- কি পড়বেন ?

- অর্থনীতি পড়ার ইচ্ছে । জানি না চান্স পাব কি না ।

- পাবেন । নিশ্চয় পাবেন । দেখবেন ঠিক ঠিক ভর্তি হয়ে গেছেন ।

ছেলেটা খুশি হয়ে গেল আবারও আনিছার কথায় ।

আনিছা বললো, আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন ?

এবার ছেলেটা চুপ হয়ে গেল ।

- কৈ বললেন না যে ?

- আপনাকে আমার ভাল লাগে ।

- কিন্তু মুখে না বলে শিস দেন কেন ?

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে গেল এইবার ।

- আমাকে ক্ষমা করবেন । আমি বুঝতে পারি নি ।

- ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি । আপনাকে একটা কথা বলার জন্য ডেকেছি ।

- বলেন ।

- আমার বাবা আমাকে অনেক অনেক লেখাপড়া করাবেন, এটা তার স্বপ্ন তারপরে আমাকে চাকরি-বাকরি করাবেন । আমি নিজের পায়ে দাঁড়ালে তারপর অন্য কিছু । বলতে পারেন সব মিলিয়ে দশ বছরের ব্যাপার । এর আগে আমি ফ্রি হতে পারবো না ।

ছেলেটা অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে রইলো ।

- আপনি বুঝেছেন ?

- জ্বি । এই যে আপনি সুন্দর করে বললেন, সে জন্য ধন্যবাদ । আমাকে ক্ষমা করবেন সব কিছুর জন্য ।

আনিছা হেসে বললো, আপনাকেও ধন্যবাদ । আপনি ভাল থাকুন ।

এরপর থেকে আনিছা স্কুলে যায় প্রতিদিন । ছেলেটাকে আর দেখে না ।

আনিছা তখন মাস্টার্সে উঠেছে কেবল । কি একটা কাজে ঢাকা যাচ্ছে । ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের জন্য । স্টেশনের ভেতরে ছোট্র একটা বইয়ের দোকান । সেই দোকানের পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে । হ্যাংলা পাতলা, গায়ে সাদা সার্ট । মুখটা খুব চেনা চেনা কিন্তু মনে করতে পারছে । অসহায় বোধ করছে আনিছা । লোকটা পাশ দিয়ে যাবার সময় আনিছার মনে পড়লো । সেই ছেলেটা যে আনিছাকে শিস দিতো । এখন কত বড় হয়েছে ছেলেটা । শক্ত মজবুত মোচ গজিয়েছে ।

আনিছার খুব হাসি পেলো কিন্তু ও হাসলো না । লোকটাকে ডেকে কথা বলবে ? লজ্জা পাবে লোকটা কিন্তু বাবার স্মৃতির সাথে লোকটা জড়িয়ে আছে । ডাকবে ? বাবার কথা মনে হলো আনিছার । আর পারলো না, লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ।

লোকটা বললো, আমাকে কিছু বলবেন ?

- হ্যাঁ, বলবো । আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন ?

লোকটা অনেকক্ষণ আনিছাকে দেখলো । হ্যাঁ, আপনি আনিছা ।

আনিছা হেসে দিলো । লোকটাও হাসলো ।

আনিছা বললো, এখন কি করছেন ?

- ঢাকাতে চাকরি করি NGO তে । ট্রেনে ঢাকা যাচ্ছি, আপনি ?

- এবার মাস্টার্সে উঠেছি । ঢাকায় যাচ্ছি কিছু কাজে ।

লোকটা বললো, আইসক্রিম খাবেন ?

- আইসক্রিম কেন ?

- সেই যে আপনি নদীর ঘাটলায় আইসক্রিম খাইয়েছিলেন ।

দুজনে হেসে উঠলো ।

আনিছা বললো, আমার কদিন হলো গলা ব্যথা । আপনার অনুরোধটা ফেলবো না । বাদাম খাওয়াতে পারেন ।

লোকটা গিয়ে বাদাম নিয়ে এলো ।

লোকটা বললো, আপনি কিন্তু আগের মতনই আছেন ।

- তাই । ভাল লাগলো শুনে ।

- একটা জিনিষ খেয়াল করেছেন ?

আনিছা বললো, কি ?

- যে নদীর ঘাটলায় আমরা গিয়েছিলাম, সেটা আর নেই । তার উপরে ব্রীজ হয়েছে । সেই ব্রীজ দিয়ে আমরা হালুয়া ঘাটে যাই । আপনি কি ময়মনসিংহে সেটল করবেন, মিস আনিছা ?

- সে রকমি ইচ্ছে ।

- ভাল । খুব ভাল ।

- দেখতে দেখতে ট্রেন এসে ঢুকলো স্টেশনের প্লাটফর্মে ।

লোকটা বললো,

অনেক ধন্যবাদ মিস আনিছা । আপনার সাথে কথা বলে ভাল লাগলো । ভাল থাকুন, এই বলে লোকটা ট্রেন বরাবর হাঁটা দিলো ।

।। চৌদ্দ ।।

শেষ রাত্তির জোছনা

আর বিশ মিনিট বাকি সকাল চারটা বাজতে । সাকিব রিকশা ধরে আনলো । বললো, আর দেরি করা যায় না ।

ময়মনসিংহ এক্সপ্রেস ঠিক ভোর চারটায় ছেড়ে যাবে ঢাকার উদ্দেশ্যে । ঠিক ঠিক ট্রেন চললে সকাল সাতটায় আনিছা ঢাকা পৌছবে তারপর এয়ারপোর্টে জাহেদ সাহেবকে বিদায় দেবার কথা আছে ।

আনিছা আর অলি রিকশায় উঠে পড়ল । অন্য রিকশায় সাকিব । এখান থেকে রেলস্টেশন দশ মিনিটের পথ । আনিছাকে ট্রেনের কামড়ায় দিয়ে ফিরে আসবে ওরা ।
- সব কিছু ঠিক মতন নিয়েছ তো ? সাকিব জানতে চাইল ।
আনিছা মাথা নেড়ে বললো,

সব নেয়া হয়েছে, শুধু পানির ফ্লাস্কটা নিতে পারলাম না । হাতের কাছে পানি থাকলে ভাল হতো । কোথায় যে রেখেছি, মনে করতে পারছি না ।
আনিছার কথা শেষ হতেই সাকিব দৌড়ে গেল । ফিরে এলো তার ফ্লাস্কটা নিয়ে ।
- ভাগ্যিস কাল রাতে পানি ফুটিয়ে রেখেছিলাম । এটা নিয়ে যাও, এই বলে ফ্লাস্কটা আনিছার হাতে তুলে দিল । এত বড় ঢাকা শহর, কোথায় ঘুরবে পানির জন্য ? হাতের কাছে রইলো । যখন ইচ্ছে খেতে পারবে ।
আনিছা কিছু বলল না । পানির ফ্লাস্কটা আলতো করে পায়ের উপর বিছিয়ে দিল ।

রিকশাটা ছেড়ে দিল । একেবারে খালি রাস্তা । পুরোটা শহর গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে । রাস্তায় কতগুলো কুকুর ঘুরছে । কতগুলো আবার মরার মতন ডেকে চলেছে ।

সেদিন ছিল ভরা পূর্ণিমা । সারাটা আকাশ নরম জোছনায় ছেয়ে আছে । সেই জোছনায় ওদের রিকশা গিয়ে পড়লো বড় রাস্তায় । বাঁ দিকে বিশাল ব্রহ্মপুত্র, জোছনায় জোছনায় ছেয়ে আছে নদীটা ।

দশ মিনিটের মাথায় রিকশাটা এসে দাড়ালো রেলস্টেশনে । ছোট-খাট রেলস্টেশন । লাল রঙের পুরোনো দালান । কয়েকটা কুকুর হাঁটছে স্টেশনের চত্বরে । ভরা পুর্ণিমায় তাদের লম্বা ছায়া পড়েছে । দূর থেকে দেখে মনে হয় কতগুলো বুনো বানর হেঁটে ফিরছে ।

রেলস্টেশনের চত্বর ছাড়িয়ে দেখা গেল ময়মনসিংহ এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে । বিশাল লম্বা সবুজ রঙের ট্রেনটা । দশ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে যাবে ।

স্টেশনে নেমে সাকিব দৌড়ে গেল টিকেট আনতে । হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো টিকেট নিয়ে । তখনি হুইসেল বেজে উঠল ট্রেনের ।
- উঠে পড় আনিছা আর দেরি করা যায় না ।

আনিছা উঠে পড়ল ট্রেনে । কামড়ার এক কোণে বসার ছিট পেলো সে । জানালার কাচটা তুলতেই শিশিরের বাতাস এসে ওর নাক-মুখ মুছে দিল ।

ধীরে ধীরে ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে । সাকিব আর অলি হাত তুলে আনিছাকে বিদায় জানালো ।
আনিছা বললো, বিকেলের ট্রেনে ফিরছি । তোমরা ভাল থেকো ।
সাকিব বললো, দেখো তো পানির ফ্লাস্কটা নিয়েছ তো ?
- এইতো, বলে ফ্লাস্কটা মেলে ধরলো আনিছা ।
সাকিব হেসে দিল, নিরাপদের হাসি । বললো, জাহেদ সাহেবকে আমাদের ছালাম দিও ।

দেখতে দেখতে ট্রেনটা স্টেশনের চত্বর থেকে বেরিয়ে এলো । তখন ভোর চারটে । পুরোটা শহর চাঁদের আলোতে তলিয়ে আছে । ট্রেনের জানালা গলিয়ে হু হু করে জলো বাতাস ভেতরে ঢুকতে শুরু করলো । জানালাটা তুলে দিল আনিছা । হেলে দুলে ট্রেনটা ছুটতে শুরু করেছে ।

আনিছার মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা । সেই যে সে ব্রহ্মপুত্রে তলিয়ে গিয়েছিল একবার । তলিয়ে যাচ্ছে আনিছা, গভীর থেকে গভীরতর জলে । হঠাৎ এক জোড়া হাত ওকে জড়িয়ে ধরলো তারপর হেঁচকা টানে তুলে আনলো উপরে । বুক ভরে শ্বাস নিলো আনিছা । তাকিয়ে দেখলো সাকিব ঝুঁকে আছে তার মুখের উপরে । থরথর করে কাঁপছে সাকিব ।

ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে । ময়মনসিংহ শহরের শেষ প্রান্তে এই স্টেশন । পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়াবে । আনিছা আর দেরি করলো না, নেমে এলো ট্রেন থেকে ।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর আবার চলতে শুরু করেছে ট্রেনটা । দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল । একা দাঁড়িয়ে আছে আনিছা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে । শেষ রাত্তির জোছনা এসে পড়েছে তার চারিপাশে ।

শেষ

Please comment about the book: sayed.hossain@yahoo.com

Please visit my website: www.sayedhossain.com

Dec 29, 2009